KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12	Year of Publication : আশ্বিন ১৩২৫ কার্তিক ১৩২৫ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ পৌষ ১৩২৫ মাঘ ১৩২৫ ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৫ Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

আমার কথা।

—ঃ০ঃ—

আমার জান্‌লার সাম্‌নে রাঙামাটির রাস্তা।

ওখান দিয়ে বোঝাই নিয়ে গোরুর গাড়ি চলে, সাঁওতাল মেয়ে খড়ের আঁটি মাথায় করে হাটে যায়, সন্ধ্যাবেলায় কলহাস্যে ঘরে ফেরে।

কিন্তু মানুষের চলাচলের পথে আজ আমার মন নেই।

জীবনের যে-ভাগটা অস্থির, নানা ভাবনায় উদ্বিগ্ন, নানা চেষ্টায় চঞ্চল সেটা আজ ঢাকা পড়ে গেচে। শরীর আজ রুগ্ন, মন আজ নিরাসক্ত।

ঢেউয়ের সমুদ্র বাহিরতলের সমুদ্র; ভিতরতলে যেখানে পৃথিবীর গভীর গর্ভশয্যা, ঢেউ সেখানকার কথা গোলমাল করে' ভুলিয়ে দেয়। ঢেউ যখন থামে তখন সমুদ্র আপন গোচরের সঙ্গে অগোচরের, গভীর-তলের সঙ্গে উপরিতলের অখণ্ড ঐক্যে স্তব্ধ হয়ে বিরাজ করে।

তেমনি আমার সচেষ্ট প্রাণ যখনি ছুটি পেল তখনি সেই গভীর প্রাণের মধ্যে স্থান পেলুম যেখানে বিশ্বের আদিকালের লীলাক্ষেত্র।

পথ-চলা পথিক যতদিন ছিলুম ততদিন পথের ধারের ঐ বট গাছটার দিকে তাকাবার সময় পাইনি; আজ পথ ছেড়ে জান্‌লায় এসেচি আজ ওর সঙ্গে মোকাবিলা সুরু হল।

আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে ও যেন অস্থির হয়ে ওঠে। যেন বলতে চায়, "বুঝতে পারচ না ?"

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, "বুঝেচি, সব বুঝেচি ; তুমি অমন ব্যাকুল হোয়ো না।"

কিছুক্ষণের জন্যে আবার শান্ত হয়ে যায়। আবার দেখি, ভারি ব্যস্ত হয়ে ওঠে ; আবার সেই থর্‌থর্, ঝর্‌ঝর্, ঝল্‌মল্।

আবার ওকে ঠাণ্ডা করে বলি, "হাঁ হাঁ, ঐ কথাই বটে ; আমি তোমারই খেলার সাথী, লক্ষহাজার বছর ধরে এই মাটির খেলাঘরে আমিও গণ্ডুষে গণ্ডুষে তোমারি মত সূর্য্যালোক পান করেচি, ধরণীর স্তন্যরসে আমিও তোমার অংশী ছিলেম।"

তখন ওর ভিতর দিয়ে হঠাৎ হাওয়ার শব্দ শুনি, ও বল্‌তে থাকে হাঁ, হাঁ, হাঁ।

যে-ভাষা রক্তের মর্ম্মরে আমার হৃৎপিণ্ডে বাজে, যা আলো-অন্ধকারের নিঃশব্দ আবর্ত্তন-ধ্বনি, সেই ভাষা ওর পত্রমর্ম্মরে আমার কাছে এসে পৌঁছয়। সেই ভাষা বিশ্বজগতের সরকারী ভাষা।

তার মূল বাণীটি হচ্চে, "আছি, আছি ; আমি আছি, আমরা আছি।"

সে ভারি খুসির কথা। সেই খুসিতে বিশ্বের অণুপরমাণু থর্‌থর্ করে কাঁপ্‌চে।

ঐ বটগাছের সঙ্গে আমার আজ সেই এক-ভাষায় সেই এক-খুসির কথা চল্‌চে।

ও আমাকে বল্‌চে, "আছ হে বটে ?"

আমি সাড়া দিয়ে বল্‌চি, "আছি হে মিতা !"

এমনি করে "আছি"তে "আছি"তে একতালে করতালি বাজ্‌চে।

(২)

ঐ বটগাছটার সঙ্গে যখন আমার আলাপ সুরু হল তখন বসন্তে ওর পাতাগুলো কচি ছিল ; তার নানা ফাঁক দিয়ে আকাশের পলাতক আলো ঘাসের উপর এসে পৃথিবীর ছায়ার সঙ্গে গোপনে গলাগলি করত।

তারপরে আষাঢ়ের বর্ষা নাম্‌ল ; ওরও পাতার রং মেঘের মত গম্ভীর হয়ে এসেচে। আজ সেই পাতার রাশ প্রবীনের পাকা বুদ্ধির মত নিবিড়, তার কোনো ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো প্রবেশ করবার পথ পায় না। তখন গাছটি ছিল গরীবের মেয়েটির মত ; আজ সে ধনীঘরের গৃহিণী ; যেন পর্য্যাপ্ত পরিতৃপ্তির চেহারা।

আজ সকালে সে তার মরকতমণির বিশনলী হার ঝলমলিয়ে আমাকে বল্‌লে, "মাথার উপর অমনতর ইঁটপাথর মুড়ি দিয়ে বসে আছ কেন ? আমার মত একেবারে ভরপূর বাইরে এস না !"

আমি বল্‌লেম, "মানুষকে যে ভিতর বাহির দুই বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়।"

গাছ নড়েচড়ে বলে উঠ্‌ল, "বুঝতে পারলেম না।"

আমি বল্‌লেম, "আমাদের দুটো জগৎ, ভিতরের আর বাইরের।"

গাছ বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ ! ভিতরেরটা আছে কোথায় ?"

—"আমার আপনারই ঘেরের মধ্যে।"

—"সেখানে কর কি ?"

—"সৃষ্টি করি।"

—"সৃষ্টি আবার ঘেরের মধ্যে! তোমার কথা বোঝবার জো নেই।"

আমি বললেম, "যেমন তীরের মধ্যে বাঁধা পড়ে' হয় নদী, তেমনি ঘেরের মধ্যে ধরা পড়েই ত সৃষ্টি। একই জিনিষ ঘেরের মধ্যে আট্‌কা পড়ে কোথাও হীরের টুক্‌রো, কোথাও বটের গাছ।"

গাছ বল্‌লে, "তোমার ঘেরটা কি রকম শুনি!"

আমি বল্‌লেম, "সেইটি আমার মন। তার মধ্যে যা ধরা পড়চে তাই নানা সৃষ্টি হয়ে উঠ্‌চে।"

গাছ বল্‌লে, "তোমার সেই বেড়া-ঘেড়া সৃষ্টিটা আমাদের চন্দ্র-সূর্য্যের পাশে কতটুকুই বা দেখায়?

আমি বল্‌লেম, "চন্দ্রসূর্য্যকে দিয়ে তাকে ত মাপা যায় না, চন্দ্র-সূর্য্য যে বাইরের জিনিষ।"

—"তাহলে মাপবে কি দিয়ে?

—"সুখ দিয়ে—বিশেষত দুঃখ দিয়ে।"

গাছ বল্‌লে, "এই পূবে হাওয়া আমার কানে কানে কথা কয়, আমার প্রাণে প্রানে তার সাড়া জাগে। কিন্তু তুমি যে কিসের কথা বল্‌লে আমি কিছুই বুঝলেম না।"

আমি বল্‌লেম, "বোঝাই কি করে? তোমার ঐ পূবে হাওয়াকে আমাদের বেড়ার মধ্যে ধরে বীণার তারে যেম্‌নি বেঁধে ফেলেচি অম্‌নি সেই হাওয়া এক সৃষ্টি থেকে একেবারে আরেক সৃষ্টিতে এসে পৌঁছয়! এই সৃষ্টি কোন্ আকাশে যে স্থান পায় তা আমিও ঠিক জানি নে।

মনে হয় যেন বেদনার একটা আকাশ আছে। সে আকাশ মাপের আকাশ নয়।"

—"আর ওর কাল?"

—"ওর কালও ঘটনার কাল নয়, বেদনার কাল। তাই সে কাল সংখ্যার অতীত।"

—"তুই আকাশ তুই কালের জীব তুমি, তুমি অদ্ভুত। তোমার ভিতরের কথা কিচ্ছুই বুঝলেম না।"

—"নাই বা বুঝ্‌লে।"

—"আমার বাইরের কথা তুমিই কি ঠিক বোঝ?"

—"তোমার বাইরের কথা আমার ভিতরে এসে যে কথা হয়ে ওঠে তাকে যদি বোঝা বল ত সে বোঝা, যদি গান বল ত গান, কল্পনা বল ত কল্পনা।"

(৩)

গাছ তার সমস্ত ডালগুলো তুলে আমাকে বল্‌লে, "একটু থামো। তুমি বড় বেশি ভাবো, আর বড় বেশি বকো।"

শুনে আমার মনে হল, "একথা সত্যি।" আমি বল্‌লেম, "চুপ করবার জন্যেই তোমার কাছে আসি, কিন্তু অভ্যাস দোষে চুপ করে করেও বকি; কেউ কেউ যেমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চলে।"

কাগজটা পেন্সিলটা টেনে ফেলে দিলেম, রইলেম ওর দিকে অনিমেষ তাকিয়ে। ওর চিকন পাতাগুলো ওস্তাদের আঙুলের মত আলোকবীণায় দ্রুততালে ঘা দিতে লাগ্‌ল।

হঠাৎ আমার মন বলে উঠ্‌ল, "এই তুমি যা দেখ্‌চ আর এই আমি যা ভাব্‌চি এর মাঝখানের যোগটা কোথায় ?

আমি তাকে ধমক দিয়ে বল্‌লেম, "আবার তোমার প্রশ্ন ? চুপ কর।"

চুপ করে রইলেম, একদৃষ্টে চেয়ে দেখ্‌লেম। বেলা কেটে গেল। গাছ বল্‌লে, "কেমন, সব বুঝেচ ?"

আমি বল্‌লেম, "বুঝেচি।"

(৪)

সেদিন ত চুপ করেই কাট্‌ল।

পরদিনে আমার মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে "কাল গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠ্‌লে 'বুঝেচি', কি বুঝেচ বল ত ?"

আমি বল্‌লেম, "নিজের মধ্যে মানুষের প্রাণটা নানা ভাবনায় ঘোলা হয়ে গেচে। তাই প্রাণের বিশুদ্ধ রূপটি দেখতে হলে চাইতে হয় ঐ ঘাসের দিকে ঐ গাছের দিকে।

—"কি রকম দেখ্‌লে ?"

—"দেখ্‌লেম, এই প্রাণের আপনাতে আপনার কি আনন্দ! নিজেকে নিয়ে পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, ফলে ফলে, কত যত্নে সে কত ছাঁটই ছেঁটেচে, কত রঙই লাগিয়েচে, কত গন্ধ, কত রস! তাই ঐ বটের দিকে তাকিয়ে নীরবে বল্‌ছিলেম, "ওগো বনস্পতি, জন্ম-মাত্রই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ যে-আনন্দধ্বনি করে' উঠেছিল সেই ধ্বনি তোমার শাখায় শাখায়। আমার মধ্যে সেই প্রথম প্রাণ আজ চঞ্চল হল। ভাবনার বেড়ার মধ্যে সে বন্দী হয়ে বসে ছিল, তুমি তাকে

ডাক দিয়ে বলেচ, "ওরে আয়নারে আলোর মধ্যে, হাওয়ার মধ্যে ; আর আমারি মত নিয়ে আয় তোর রূপের তুলি, রঙের বাটি, রসের পেয়ালা !"

মন আমার খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে কিছু বিমর্ষ হয়ে বল্‌লে, "তুমি ঐ প্রাণের কথাটাই নিয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করে থাক, আমি যেসব উপকরণ জড় করচি তার কথা এমন সাজিয়ে সাজিয়ে বলনা কেন ?"

—"তার কথা আর কইব কি ! সে নিজেই নিজের টঙ্কারে ঝঙ্কারে হুঙ্কারে ক্রেঙ্কারে আকাশ কাঁপিয়ে রেখেচে। তার ভারে, তার জটিলতায়, তার জঞ্জালে পৃথিবীর বক্ষ ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। ভেবে পাই নে এর অন্ত কোথায়। থাকের উপরে আর কত থাক উঠ্‌বে, গাঁঠের উপরে আর কত গাঁঠ পড়বে ? এই প্রশ্নেরই জবাব ছিল ঐ গাছের পাতায়।"

—"বটে ? কি জবাব, শুনি।"

—"সে বল্‌চে, প্রাণ যতক্ষণ নেই ততক্ষণ সমস্তই কেবল স্তূপ, সমস্তই কেবল ভার। প্রাণের পরশ লাগবামাত্রই উপকরণের সঙ্গে উপকরণ আপ্‌নি মিলে গিয়ে অখণ্ড সুন্দর হয়ে ওঠে। সেই সুন্দর-কেই দেখ এই বনবিহারী। তারি বাঁশি ত বাজচে বটের ছায়ায়।"

(৫)

তখন কবেকার কোন্ ভোর রাত্রি।

প্রাণ আপন সুপ্তিশয্যা ছাড়ল ; সেই প্রথম পথে যাত্রা হল অজানার উদ্দেশে, অসাড় জগতের তেপান্তর মাঠে।

তখনো তার দেহে ক্লান্তি নেই, মনে চিন্তা নেই ; তার রাজপুত্তুরের সাজে না লেগেচে ধূলো, না দেখা দিয়েচে ছিদ্র।

সেই অক্লান্ত নিশ্চিন্ত অম্লান প্রাণটিকে দেখ্‌লেম এই আষাঢ়ের সকালে, ঐ বট গাছটিতে। সে তার শাখা নেড়ে আমাকে বল্‌লে, "নমস্কার!"

আমি বল্‌লেম, "রাজপুত্তুর, মরুদৈত্যটার সঙ্গে লড়াই চল্‌চে কেমন বল ত?"

সে বল্‌লে, "বেশ চল্‌চে, একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখ না।"

তাকিয়ে দেখি, উত্তরের মাঠ ঘাসে ঢাকা, পূবের মাঠে আউশ ধানের অঙ্কুর, দক্ষিণে বাঁধের ধারে তালের সার ; পশ্চিমে শালে তালে মহুয়ায়, আমে জামে খেজুরে, এম্‌নি জটলা করেচে যে দিগন্ত দেখা যায় না।

আমি বল্‌লেম, "রাজপুত্তুর, ধন্য তুমি! তুমি কোমল তুমি কিশোর, আর দৈত্যটা হল যেমন প্রবীন তেমনি কঠোর ; তুমি ছোট, তোমার তূণ ছোট, তোমার তীর ছোট, আর ও হল বিপুল, ওর বর্ম্ম মোটা, ওর গদা মস্ত। তবু ত দেখি দিকে দিকে তোমার ধ্বজা উড়ল ; দৈত্যটার পিঠের উপর তুমি পা রেখেচ, পাথর মান্‌চে হার, ধূলো দাসখৎ লিখে দিচ্ছে।"

বট বল্‌লে, "তুমি এত সমারোহ কোথায় দেখ্‌লে?"

আমি বল্‌লেম, "তোমার লড়াইকে দেখি শান্তির রূপে, তোমার কর্ম্মকে দেখি বিশ্রামের বেশে, তোমার জয়কে দেখি নম্রতার মূর্ত্তিতে। সেই জন্যেই ত তোমার ছায়ায় সাধক এসে বসেচে ঐ সহজ যুদ্ধ-

জয়ের মন্ত্র আর ঐ সহজ অধিকারের সন্ধিটি শেখবার জন্যে। প্রাণ যে কেমন করে' কাজ করে, অরণ্যে অরণ্যে তারি পাঠশালা খুলেচ। তাই যারা ক্লান্ত তারা তোমার ছায়ায় আসে, যারা আর্ত্ত তারা তোমার বাণী খোঁজে।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রেনাঁর কয়েক পৃষ্ঠা।*

—:০:—

অতীতের প্রতি M. de Sacy-র টান স্পষ্ট, ফলে তিনি যে বর্ত্তমানের উপর কঠোর হইয়া উঠিবেন ইহা স্বাভাবিক। M. de Sacy-র স্বভাব মন্দের ভাগটাই বেশি করিয়া দেখা, কিন্তু এজন্য তাঁহাকে কোনই দোষ দেওয়া যায় না। কারণ এমন সময়ও আসিয়া থাকে যখন কেবল ভাল দেখাই যার স্বভাব, তাঁর যে মনের একটা সঙ্কীর্ণতা, অন্তঃকরণের একটা নাচতা আছে—এ সন্দেহ আমাদের আপনা-হতেই হয়। প্রাচীন জগৎকে শক্তিশালী করিয়া রাখিয়াছিল এত যে সৎগুণ, সে সব হারাইয়া আধুনিক সমাজ বিশেষ সঙ্কটের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে—M. de Sacy-র এ কথার সহিত আমি একমত। কিন্তু আমাদের যুগে যে জ্ঞানচর্চ্চা চলিয়াছে তাহার মূল্য যে কি ভাবে নির্দ্ধারণ করিব, সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার মতের একটু পার্থক্য আছে। আমাদের এ যুগ, জগতের ও মানবজাতির সঠিক তত্ত্বটি যতদূর তলাইয়া দেখিয়াছে আর কোন যুগ তাহা করে নাই; আমার মনে হয়, আমাদের সমসাময়িক হাজার কয়েক ব্যক্তির মধ্যে যে পরিমাণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সূক্ষ্মঅনুভূতি, সত্য তত্ত্বজ্ঞান, এমন কি মার্জ্জিত অন্তঃপ্রকৃতি দেখিতে পাই, সমস্ত যুগগুলি একত্র করিলেও সেখানে তাহা পাই না। কিন্তু এই যে বিপুল জ্ঞানসম্পদ, যদিও আমি বলিতেছি

* মূল ফরাসী হইতে—।

ইহার তুলনা কোন যুগে নেই, তবুও এটি আমাদের যুগের বাহিরেই পড়িয়া আছে, ইহার প্রভাব আমাদের যুগের উপর খুব অল্পই। একটা স্থূল জড়বাদ ক্রমে ক্রমে মানুষকে যেন চালাইয়া লইতে চাহিতেছে, সাক্ষাৎ কাজের হিসাবেই সব জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছে। সৌন্দর্য্যবোধকে বা শুধু কৌতূহলকে চরিতার্থ করা ছাড়া যে জিনিষের অন্য কোন সার্থকতা নাই, তাহাকেই একপাশে ঠেলিয়া ফেলিতেছে। ঘর-গৃহস্থালীর ভাবনা চিন্তা লইয়া প্রাচীন জনসঙ্ঘ খুব কমই ব্যাপৃত থাকিত, বর্ত্তমানে তাহাই কিন্তু হইয়া পাড়য়াছে মহৎ অনুষ্ঠান। আমাদের পিতৃপুরুষদের পুরুষোচিত প্রয়াস সমূহের স্থান অধিকার করিয়াছে যত তুচ্ছ ক্লেশ। যে ধর্ম্মের বা যে তত্ত্ববাদেরই ভাষায় বলি না কেন, মানুষ ইহজগতে আছে ভোগের লাভেরও উপরে একটা অতীন্দ্রিয় আদর্শোচিত লক্ষ্যের জন্য। ঐ লক্ষ্যটির কাছে পৌঁছাইয়া দিতে আধিভৌতিক উন্নতি আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছে কি? আগের তুলনায় মানুষ মোটের উপর বেশি বুদ্ধিমান, বেশি চরিত্রবান, স্বাধীনতার জন্য বেশি লালায়িত, সুন্দর জিনিষের উপর বেশি আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কি? ইহাই জিজ্ঞাস্য। উন্নতি হইতেছে, বিশ্বাস করা যাইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া কতকগুলি সুখসুবিধা হইবে এই আশায় অন্তঃকরণকে ছোট হইতে দেখিয়াও যে লজ্জা পায় না, উন্নতির প্রতি তাহার মত দারুণ অবিশ্বাস না থাকিলেও চলে। মানবজীবন স্পৃহনীয়, কেননা মানবজীবনের আছে একটা অর্থ, একটা মূল্য যাহাকে হারাইয়া ঐ সুখসুবিধা লাভ করাকে প্রকৃত উন্নতিকামী মানুষ কখন যথেষ্ট মনে করিবেন না।

সত্য বটে, আধিভৌতিক উন্নতি হেয় নয়; দুইটি সমাজ যদি

বুদ্ধিতে ও চরিত্রে সমান হয় কিন্তু একটিতে যদি থাকে বাহ্যিক উন্নতির বহুল বিকাশ, আর একটিতে যদি তাহা না থাকে, তবে নিঃসন্দেহচিত্তে প্রথমটিকেই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তবে যে কথাটা মানিয়া লওয়া উচিত নয় তাহা এই যে, ভৌতিক উন্নতি নৈতিক অবনতির ক্ষতিটা পূরণ করিয়া দিতে পারে। সমাজ যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে তার চিহ্ন আমরা একেবারে নিঃসন্দেহে পাই তখন, যখন দেখি বড় উদ্দেশ্য লইয়া দ্বন্দ্ব আর নাই, ফলে যখন ব্যবসাবাণিজ্য ও দণ্ডবিধানের সমস্যার তুলনায় মহা রাজনৈতিক সমস্যা সব গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক জাতিরই জীবন-ইতিহাসে এমন একটা প্রলোভনের সময় উপস্থিত হয়, সয়তান যখন তাহাকে জগতের সম্পদ দেখাইয়া দিয়া বলে, "এ সবই তোমাকে দিব, আমাকে যদি পূজা কর।"

তাই বলিয়া নৈতিকবল যে সকল প্রাচীন যুগেরই সাধারণ সম্পত্তি ছিল, এ অত্যুক্তিও যেন আমরা না করিয়া বসি। কারণ, চিরকালও জিনিষ ছিল অল্প কয়েকজনেরই অলঙ্কার। স্বল্প সংখ্যক এক অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যেই ন্যস্ত রহিয়াছে মানুষের মহত্ত্ব; এই অভিজাত শ্রেণী বাঁচিয়া থাকিবার, আপনাকে ছড়াইয়া দিবার আবহাওয়া পাইতেছে কি না, সেই অনুসারেই স্থির করিতে হইবে মানবজাতির ধর্ম্মবল বাড়িতেছে না কমিতেছে। ফলত এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের মহা বিস্তার ব্যবসাদার নয় যাহারা, অর্থাৎ—পুরাকালে যাহা-দিগকে বলা হইত সম্ভ্রান্ত (noble) তাহাদের উপর একটা বিপুল দাবি খাড়া করিয়া জগৎকে যেন নিজের ছাঁচে ঢালাই করিয়া ফেলিতেছে। আধুনিক সমাজের একটা অলঙ্ঘ্য নিয়মের তাড়ণায় প্রত্যেক ব্যক্তি যে প্রতিভা বা যে মূলধনের অধিকারী হইয়াছে সেটিকে খাটাইয়া লইতে ক্রমেই

বাধ্য হইয়া পড়িতেছে, টাকার হিসাবে যে ব্যক্তি কিছুই উৎপাদন করিতেছে না তাহার জীবন যাত্রা অসম্ভবই হইয়া উঠিতেছে। নব্যতন্ত্রের দলভুক্ত কেহ কেহ এই পরিণামটি স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন যে যতদিন তাঁহাদের মত সব শ্রেণীই বৈশ্য না হইয়া উঠে ততদিন বৈশ্যবৃত্তি কোন না কোন শ্রেণীর পক্ষে অনিষ্টকর হইবেই। এ রকম অবস্থা যদি চরমে যাইয়া পৌঁছে (অবশ্য আমি মানি তাহা কখনো ঘটিবে না), তবে তাহার ফল হইবে এই যে, যাঁহাদের কর্ম্মটি হইতেছে আর্থিক সুবিধার কাছে অন্তরের স্বাধীনতাকে কখনো বলি না-দেওয়া, তাঁহাদের পক্ষে এ পৃথিবী আর বাসের যোগ্য থাকিবে না—এ কথা কে না বুঝিবে? শিল্পীকে তুমি ব্যবসাদার করিয়া তুলিবে, সে কি ক্রেতার হুকুম অনুসারে, মূর্ত্তি গড়িবে, না ছবি আঁকিবে? ইহার অর্থ কি এই নয় যে উঁচুদরের শিল্পকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করা? এ শিল্প ত, যে-শিল্প তুচ্ছভাব ও ইতর রুচির সঙ্গে মিশ খাইয়া চলে, তাহার ন্যায় লাভের নয়। জ্ঞানীকে তুমি ব্যবসাদার করিয়া তুলিবে, তিনি কি সাধারণের জন্য গ্রন্থ রচনা করিতে থাকিবেন? কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে রচনা যত মূল্যবান হয় তাহার পাঠকও তত কম হইতে বাধ্য। আমাদের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ, তিনি আবার সেই সঙ্গে ছিলেন গুণীপুরুষ, নাম তাঁর 'আবেল' (Abel), তিনি ত দারিদ্র্যেরই মধ্যে প্রাণ হারাইলেন। সুতরাং মানুষের কয়েকটি শ্রেষ্ঠসৃষ্টি সম্বন্ধে, এ কথা স্পষ্টই দেখা যায় যে কাজের মূল্য আর তার পরিশ্রমের মূল্য, এই দুইএর মধ্যে আছে একটা বিপুল অসামঞ্জস্য, অথবা আরও ঠিক বলিতে গেলে, কাজের মূল্য আর পরিশ্রমের মূল্য, এ দুটি চলে বিপরীত

অনুপাতে। ফলে দাঁড়াইল এই যে, যে-সমাজে স্বাধীন জীবন কঠিন হইয়া পড়িতেছে, যেখানে সাধারণের প্রয়োজন অনুসারে যে উৎপাদন করে সে, যে কিছুই উৎপাদন করে না তাহাকে পদদলিত করিয়াই চলিয়াছে, সে-সমাজে পরিশেষে সকল উচ্চবৃত্তিই লোপ পাইয়া বসে, অর্থাৎ—সে-সমাজের উৎপাদিকা শক্তি রহিত হইয়া পড়ে। মধ্যযুগ এই সত্যে এতদূর অনুপ্রাণিত হইয়া গিয়াছিল যে তখন এমন উদ্ভট ব্যবস্থাও দেওয়া হয় যে দারিদ্র্যও একটা সৎগুণ, আধ্যাত্মিক কর্ম্মে ব্রতী যিনি, তিনি ভিক্ষা দ্বারাই জীবনযাপন করিবেন। এ মতে স্বীকার করা হইয়াছিল যে জগতে দাম দিয়া কেনা যায় না এমন জিনিষও আছে; বাহিরের কোন মূল্য দিয়াই ভিতরের বস্তুকে নিরূপণ করা যায় না, আর অন্তরাত্মার জন্য যে সেবা, তাহার এমন কোন পারিশ্রমিকই নাই যাহাকে বেতন নাম দেওয়া যাইতে পারে। খৃষ্টীয় চার্চ্চ যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়া এই নীতিটিই ধরিয়া রখিয়াছে; অর্থ দিয়া তাহার দাবি যে চুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, একথা সে কখনও স্বীকার করিবে না, সে বলে সে চিরদিনই গরীব। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী হইলেও সে বলিতে থাকিবে, জড়বস্তু বিষয়ে, সে কিছুই চাহে না, চাহে শুধু সেণ্টপল যাহা চাহিয়াছেন—গ্রাসাচ্ছাদন।

জড়বস্তুর উপর মানুষের আধিপত্য যে বাড়িয়া উঠিয়াছে ইহা একটি স্পষ্ট লাভ, এদিক দিয়া আমাদের যুগের যে উন্নতি হইয়াছে তাহাকে প্রশংসা করিতেই হইবে। কিন্তু এ রকম উন্নতি যদি প্রকৃতির বাধাসমূহের উপরে জয়ী করিয়া মানুষকে আপন আদর্শ সাধনের সহায়তা করিতে পারে তবেই শুধু তাহার পূর্ণ সার্থকতা। প্রয়োজনের ভোগের জিনিষকে পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে

লইয়া আসা অপেক্ষা একটি সুন্দর চিন্তা, একটি মহৎভাব, একটি সৎকার্য্যের স্রষ্টা বলিয়াই মানুষকে প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির রাজা বলা চলে। এই রাজত্ব হইতেছে আমাদের অন্তরাত্মায়। যে জড়বাদী জীবনের দিব্য অর্থটি না বুঝিয়া ভূমণ্ডলের উপরে উপরেই ওলট-পালট খাইতেছে, সে নয়, কিন্তু থৈরাইদ মরুভূমির তপস্বী, হিমালয়শৃঙ্গের ধ্যানী নানাহিসাবে প্রকৃতির দাস হইলেও তাঁহারাই হইতেছেন উহার অধীশ্বর, তাঁহারাই অন্তরাত্মার দিক দিয়া উহার ব্যাখ্যা দিতেছেন। আমাদের তুচ্ছ আনন্দ অপেক্ষা তাঁহাদের দুঃখবাদও সৌন্দর্য্যে ভরপুর অতএব অনেক শ্রেয়। তাঁহাদের উন্মত্ততাই মানবপ্রকৃতিকে বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে—আর যে সব মানুষের জীবন স্থিরবুদ্ধি-পরিচালিত বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা কিন্তু শুধু লাভলোক্সানের হিসাব গত স্বার্থাভিমানের তুচ্ছ কলহে পরিপূর্ণ।

সুতরাং M. de Sacy-র এ অনুযোগ ন্যায়সঙ্গত যে আমাদের সমাজে কত শত ভাল জিনিষের আর স্থান নাই, তাহারা আজ লোপ পাইতে বসিয়াছে। এসব জিনিষ আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনে আসে না, ইহাদের অভাবও তাই চক্ষে ধরা পড়ে না; কিন্তু একদিন দেখা যাইবে ইহারা চলিয়া গিয়া জগতের মধ্যে কি বিপুল ফাঁকাই রাখিয়া গিয়াছে। শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের যুগের ভুল এই যে আমরা বুঝিতেই চাই না, যে বিশেষ বিশেষ বিদ্যা—যে বিদ্যা ব্যবহারে আসে, তাহার উপরে আছে একটা সাধারণ জ্ঞানমাহাত্ম্য। সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও আমরা সেই একই ভুল করিতেছি। প্রয়োজনের খাপে খাপে যাহা মিলিয়া যায় না তাহাকেই আমাদের মনে হয় আড়ম্বর-অলঙ্কার। সত্য বটে, ভদ্রলোক লোপ পাইলেও ক্ষুণ্ণ

হইবার কিছু নাই ; কারণ এ নামটি দেয় জন্মের পরিচয়, আর আজকাল সকল শ্রেণী হইতে প্রায় সমান পরিমাণেই কৃতী লোকের উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইতে হয় সৎলোক হারাইয়া—এ কথাটি আমি ব্যবহার করিতেছি ১৭শ অব্দে ইহার যে অর্থ ছিল সেই অর্থে, অর্থাৎ—সেই লোক যিনি বিশেষ কোন পেশার দিক দিয়া কোন জিনিষকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখেন না, যাঁহার মনে বা চলনে বিশেষ কোন শ্রেণীর ভঙ্গিমা নাই। বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম প্রায়ই বিশেষ বিশেষ অভ্যাসের সৃষ্টি করে, এমন কি সে কর্ম্মে ভাল রকম সফল হইতে হইলে, প্রত্যেকের, যাহাকে বলা হয় বৃত্তিগত মন, সেটি থাকা চাই। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব (nobility) জিনিষটি ত ঠিক এইখানেই, যে তাহার এরকম কোনই বন্ধন নাই ; কোন বিশেষ ব্যবসা নাই যাহাদের, তাহাদের দিয়াই ত বিশেষ ব্যবসা আছে যাহাদের, তাহাদের পার্থক্যটি দেখান সম্ভবপর। এসব লোকের ধনী হওয়া উচিত নয়, কারণ টাকার হিসাবে ইহারা সমাজকে কিছুই দেয় না। কিন্তু ইহাদেরই হওয়া উচিত আভিজাত্য—আভিজাত্য কথাটি এখন হইতে এই নিতান্ত বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করিতে হইবে ; তবেই মানুষ যে-সব জিনিষ লইয়া চলে তাহাদের মোট ধরণটির মর্য্যাদা বজায় থাকিবে, তবেই নানা বিভিন্ন-দিক হইতে জীবনকে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইবার লোক মিলিবে। যে-সব লোক বিশেষ কাজে ব্রতী, বিশেষ দিক দিয়াই দেখিতে অভ্যস্ত যাহারা, তাহারা ত হৃদয়ঙ্গম করে না জীবনের নানা বিভিন্ন দিকের কি প্রয়োজন।

যে-সব জিনিষ সূক্ষ্ম, যাহা সুদূরের দিকে চাহিয়া আছে, আধুনিক সমাজসংস্কারকগণ সে সকলকে দিয়াছেন একটা অতি সঙ্কীর্ণ ভিত্তি ;

আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে এই জন্য উহাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে। যাহা মহৎ, তাহা যে হইবে, তাহার আর সম্ভাবনা নাই। সুপরিপক্ক পূর্ণাঙ্গ হইতে, জিনিষের দরকার দুই বা তিন শত বৎসর আয়ু, আমরা দেখি যে আমাদের জীবনকালের মধ্যে বিধাতা ও তাঁর বিধান দশবার বদলাইয়া যাইতেছে। মানুষের মধ্যে কাব্যকলার আসন্নমৃত্যুও ঐ জন্যই। কবিতা জিনিষটি সমস্তই অন্তরাত্মার ভিতরে, ভাবুকতার মধ্যে। কিন্তু আমাদের যুগের প্রবৃত্তিই হইতেছে সব জায়গায় ভিতরের যন্ত্রের পরিবর্ত্তে বাহিরের যন্ত্র দিয়া কাজ করা। খুব তুচ্ছ একটা জিনিষ, এই সামান্য একখণ্ড বস্ত্রও প্রায় ভিতরের জিনিষ হইয়া, মানুষভাব ধরিয়াই উঠে যখন দেখি তাহার প্রত্যেক বুননটির সাথে সাথে মিশিয়া আছে শতাধিক সজীব সত্ত্বার নিশ্বাসপ্রশ্বাস, তাহাদের হৃদয়ানুভূতি, হয়ত বা তাহাদের দুঃখ কষ্ট, যখন দেখি তাঁতিনী ঝাঁপটি উঠাইতে নামাইতে তাঁতী মাকুটি স্বল্পাধিক দ্রুততালে ঠেলিতে ঠেলিতে কাজের সাথে তাহাদের চিন্তা, তাহাদের কাহিনী, তাহাদের গান জড়াইয়া সে বস্ত্রখানি তৈয়ার করিয়াছে। আজ কিন্তু সে সকলের স্থান অধিকার করিয়াছে প্রাণহীন সৌন্দর্য্যহীন একটা যন্ত্র। প্রাচীনকালের যন্ত্রটি মানুষের সাথে অদ্ভুত ভাবে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল, তাই ক্রমে তাহার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল জীবাধারেরই মত জীবন্ত ঐক্য, একটা নিখুঁত সামঞ্জস্য। আধুনিককালের যন্ত্রটি হইতেছে কিন্তু কদর্য্য, তাহার না আছে শ্রী, না আছে সৌষ্ঠব ; সে কখনো মানুষের অঙ্গ হইয়া উঠিতে পারিবে না। তাহার সেবা যে করে সে আপনাকেই ক্ষুদ্র পশুস্বভাব করিয়া ফেলে; প্রাচীন যন্ত্রটির মত সে আর তাহাকে বন্ধু ও সহায়রূপে পায় না।

মানুষের দেবভাব শুধু তাহার অন্তরাত্মারই দিক দিয়াই ; বুদ্ধিকে ও স্বভাবকে সে যদি কতক পরিমাণে নির্দ্দোষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে, তবেই সে তাহার জীবনের লক্ষ্যস্থলে গিয়া পৌঁছিল। এই সুমহৎ উদ্দেশ্যের যাহা সহায় হইতে পারে, তাহা কিছুই অদরকারী নয় ; কিন্তু স্থূলজগতের যে-সব উন্নতি, সাথে সাথে তাহারা মনকে ও স্বভাবকে উন্নত করিতে পারে না, অতএব তাহাদের নিজস্ব যে কিছু মূল্য আছে, এ বিশ্বাস একটি মস্ত ভুল। বাহিরের বস্তুর ততখানিই মূল্য, যতখানি মানুষের ভিতরের ভাবের সহিত তাহার মিল আছে। আজকাল অতি সামান্য একটি বাগানে যে-সব ফুল পাওয়া যায়, এককালে তাহা থাকিত শুধু রাজার উদ্যানে। কিন্তু ভগবানের গড়া ক্ষেতের ফুলই যে মানুষের প্রাণে গিয়া কথা কহিত, মানুষের প্রাণে যে জাগাইয়া তুলিত প্রকৃতির প্রতি একটা সুমধুর ভাব, তাহাতে কি আসে যায় ? আজকাল সকল রমণীই যে রকমে সাজসজ্জা করিতে পারে, আগে কেবল রাজরাণীরাই তাহা পারিতেন ; কিন্তু সেজন্য আজকালের রমণী যদি বেশি সুন্দর বেশি চিত্তাকর্ষক না হয়, তাতেই বা কি আসে যায় ? ভোগের পন্থা সহস্রভঙ্গীতে সূক্ষ্ম করিয়া অসংখ্যগুণে বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে ; তবে ইহা সব ক্লান্তির বিরক্তির বিষে জর্জ্জরিত, আর আমাদের পিতৃপুরুষদের দারিদ্র্যের মধ্যেই ছিল বেশি আনন্দ, বেশি তৃপ্তি ; কিন্তু কি আসে যায় তাতে ? ব্যবসা-বাণিজ্যের যে উন্নতি হইয়াছে সেই অনুপাতে বুদ্ধিবৃত্তিরও উন্নতি হইয়াছে কি ? আমাদের পূর্ব্বেই যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন সমাজের একটা জলন্ত জীবন্ত গতিধারা, আজ পর্য্যন্ত তাহাই ধরিয়া বাঁচিয়া আছি—তাঁহাদের মত সুন্দর জিনিষ

ধারণা করিবার আমাদের সামর্থ্য আছে কি ? শিক্ষাকে কি আরও উদার করিয়া তোলা হইয়াছে ? মানুষের প্রকৃতি কি শক্তিতে, মহত্ত্বে বাড়িয়া উঠিয়াছে ? নূতন যুগের মানুষের মনে উচ্চভাব, অন্তঃকরণের মহত্ত্ব, জ্ঞানের চর্চ্চা, আপন মতের উপর নিষ্ঠা, ধন ও ক্ষমতার প্রলোভনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার তেজ বেশি পরিমাণে কি পাওয়া যায় ? এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করিব না। আমি শুধু বলিব, এ সব জিনিষ ছাড়া উন্নতি আর কিছুতে নাই। যতদিন এ রকম উন্নতি না হইতেছে, ততদিন অতীতের সৎগুণরাশী হারাইয়া পাইলাম আরামে থাকার সুব্যবস্থা কিন্তু সুখের মাত্রা তাহাতে বেশি হইল না, পাইলাম নিষ্কণ্টক শান্তিভোগ, কিন্তু হইল না স্বভাবের উৎকর্ষ ; এই বিনিময়ে মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে যাহারা তাহারা কোনই সান্ত্বনা পাইবে না।

পত্র।

—:—

শ্রীমান চিরকিশোর

কল্যাণীয়েষু।

তুমি আমার গত পত্রের উত্তরে জিজ্ঞাসা করেছ যে—

"না হয় মনস্থির করলুম যে—অতঃপর সাহিত্যেরই চাষ করব। কিন্তু লিখি কি? লেখবার বিষয় নিয়েই ত যত গোল।"—

এ প্রশ্ন আমার মনকে যে ব্যতিব্যস্ত করে নি, তা নয়। অনেক দিন এর কোনো জবাব খুঁজে পাই নি। তারপর একদিন এর একটা সদুত্তর আপনা হতে আমার মনে এসে গেল, আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলুম যে সাহিত্যের কোনো বিষয় নেই। এই নব আবিষ্কৃত মত পাছে আবার হারিয়ে ফেলি, এই ভয়ে তখন মনের মধ্যে যে সব কথা উদয় হয়ে ছিল—সে সব আর কাল বিলম্ব না করে লিপিবদ্ধ করে ফেললুম। সে লেখা অবশ্য প্রকাশ করবার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কেন যে তা প্রকাশ করি নি, তার কারণ শুনবে?—পাছে লোক আমাকে dilettente বলে, এই ভয়ে লেখাটা চেপে রেখেছিলুম। জানই ত আমি সেই সব ইংরেজি কথাকে বড় ডরাই যার ঠিক মানে আমরা কেউ জানি নে অথচ সবাই যখন-তখন আওড়াই। যে লেখা প্রবন্ধ হিসাবে চলবে না, সেটা পত্র হিসাবে চলতে পারে, এই বিশ্বাসে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সাহিত্যের বিষয়।

আজ আমার একটি পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যখন সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয় তখন আমার জনৈক আকৈশোর বন্ধু আমাকে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে অনুরোধ করেন। কি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করব জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করেন যে, কোন বিষয়েই নয়। এ প্রস্তাবে আমি নিজেকে মহা সম্মানিত মনে করি, কেননা এ অনুরোধ হচ্ছে আকাশ-কুসুম রচনা করবার অনুরোধ, অতএব আমি ধরে নিলুম যে বন্ধুবরের মতে সাহিত্য-জগতে আমি একটি অদ্ভুতকর্ম্মা-ব্যক্তি এবং আমার লেখনী হচ্ছে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী।

আমি অবশ্য তাঁর অনুরোধ রক্ষা করি নি। কিন্তু তারপর ভেবে দেখলুম তাঁর প্রস্তাবটি একেবারে অসঙ্গত নয়। মানুষে যা করেছে মানুষে তা করতে পারে। এই ভূতাকাশে মানুষ যে ফুল ফুটিয়াছে সে কথা আর কারো কাছে অবিদিত নেই। আমরা যাকে আতসবাজি বলি তার উদ্দেশ্য আকাশে ফুল ফোটানো ছাড়া আর কি? সকলেই প্রত্যক্ষ করেছে যে প্রকৃতির হাতে-গড়া ফুলের চাইতে মানুষের হাতে গড়া এই সব আকাশকুসুমের বর্ণ ঢের বেশি উজ্জ্বল, আর ঢের বেশি বিচিত্র, এমন কি তুবড়ির ফুলের পাশে আকাশের তারাও হীনপ্রভা হয়ে পড়ে। এই অমূলক ফুলের উপরে গাছের ফুল শুধু এক বিষয়ে টেক্কা দিতে পারে, সে হচ্ছে তার স্থায়ীত্বে। প্রকৃত ফুলের জীবনের মেয়াদ একসন্ধ্যে, আর কৃত্রিম ফুলের এক মুহূর্ত্ত। কিন্তু এ প্রভেদ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। কার আত্মা এক মুহূর্ত্তে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ

করে, আর কার আত্মা এক প্রহরে, অনন্তকালের হিসেবে তা গণনার মধ্যেই আসে না। এ জগতে সংই অনিত্য, সম্ভবত হয় পরমাত্মা নয় পরমাণু ছাড়া, সুতরাং কালের হিসেবে সব পদার্থেরই মূল্য সমান, কিন্তু আমাদের হিসেবে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর মূল্যের তারতম্য অগাধ এবং সে তারতম্য নির্ভর করে, হয় বস্তুর রূপের নয় তার গুণের উপর। পৃথিবীতে যার কোনো মূল নেই এমন ফুল যদি কেউ আকাশে ফোটাতে পারে তাহলে এক রূপের গুণেই তা আমাদের কাছে চিরদিন অমূল্য হয়ে থাকবে।

ভূতাকাশের আঁধার ঘরে আলোর ফুল ফোটানো, মানুষের পক্ষে ছেলেখেলা হতে পারে, কিন্তু চিদাকাশে ঐ ফুল ফোটানোই হচ্ছে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতীত্ব। আমরা যাকে কাব্য বলি,—তার প্রতিটিই এক একটি আকাশ কুসুম, কেননা সে সব ফুলের মূল বস্তুজগতে নেই, আছে শুধু মনোজগতে। মেঘদূতের অলকা আর শকুন্তলার তপোবন, দুটি অপূর্ব্ব সুন্দর আকাশ কমল বই আর কি? এ দুয়ের ভিতর প্রভেদ শুধু বর্ণে; একটির রঙ লাল আর একটির শাদা। অলকা কবির হৃদয়ের তাজা রক্তে রঞ্জিত আর মালিনীর তীরস্থ তপোবন কবির আত্মার শুভ্র আলোকে উদ্ভাসিত। এ উভয়ই আকাশ দেশের বস্তু, অর্থাৎ—এ উভয়ই চিরদিন মানুষের হাতের বাইরেই আছে এবং থেকে যাবে। এবং এ উভয়ই অজর এবং অমর, কেননা মর্ত্ত্যভূমির সঙ্গে উভয়ই সম্পর্কশূন্য। সুতরাং সাহিত্য-জগতে আকাশকুসুম রচনা করা শুধু যে সম্ভব তাই নয়, ঐ হচ্ছে কবিপ্রতিভার চরম সৃষ্টি। এই কারণেই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে কবির ভারতীকে "নিয়তিকৃত নিয়ম রহিতাহ্লাদৈকময়ী, অনন্যপরতন্ত্রা" বলা হয়েছে। তবে যে আমি

আমার বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করি নি, তার কারণ এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে, আমি কবি নই, আর এক শ্রেণীর জীব।

আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি ছাড়া অপর কেউ যদি আমাকে এ অনুরোধ করতেন, তাহলে আমি মনে ভাবতুম যে উক্ত প্রস্তাবের অন্তরে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ আছে। উক্ত বন্ধুবর সম্বন্ধে সে সন্দেহ মনে উদয় হয় না, কেননা তিনি হচ্ছেন একজন পরম থিয়োজফিষ্ট। আমরা সম্ভব অসম্ভবের ভিতর যে লজিকের সীমারেখা বসিয়ে দিই, তাঁর কাছে সে রেখার আসলে কোনো অস্তিত্বই নেই। সুতরাং তাঁদের ভাষায় অসম্ভব বলে কোনো শব্দই নেই। সে যাই হোক, অপর কেউ যদি আমাকে এমন একটি প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করতেন যার কোনো বিষয় নেই, তাহলে আমি ধরে নিতে পারতুম যে তিনি ঐ অনুরোধচ্ছলে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে আমার লেখার ভিতর কোনো বস্তু নেই। আমার লেখা সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য মধ্যে মধ্যে আমার কর্ণগোচর হয়েছে। কারো কারো মতে আমার লেখার অন্তরে কোনো সার নেই, যা আছে সে হচ্ছে শুধু হাসি-তামাসা, কথার মারপেঁচ, অর্থাৎ—তাতে শ্লেষ আছে, উপমা আছে, অনুপ্রাস আছে, বক্রোক্তি আছে, ব্যঙ্গোক্তি আছে, আর কিছু নেই। আর কিছু যদি থাকে ত সে হচ্ছে অ-বস্তু। এক কথায়, সাহিত্যে আমি বিনি সুতোয় কথার মালা গাঁথি, এ কথা যদি সত্য হত তাহলে আমি সত্য সত্যই নিজেকে ধন্য মনে করতুম। আমার কলমের মুখ দিয়ে যদি কথার রঙ-বেরঙের ফোয়ারা ছুটত—তারপরে তার পুষ্পবৃষ্টি হত তাহলে সকলকেই স্বীকার করতে হত যে আমার ভারতী "নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা, হ্লাদৈকময়ী এবং অনন্য পরতন্ত্রা" অর্থাৎ—আমি একজন জাতকবি। সমালোচকেরা ভুলে যান

যে, একমাত্র আর্টিষ্টের লেখনীর ডগা দিয়েই ভাব ফুলের আকারে ফুটে ওঠে, আর ভাষা তারা কাটে। সুতরাং এ ব্যাজস্তুতি আমি আত্মসাৎ করতে একেবারেই অপারগ। এ জ্ঞান আমার আছে যে আমি কবিও নই, আর্টিষ্টও নই,—আমি হচ্ছি একজন একেলে নৈয়ায়িক, সাহিত্যের আসরে তর্ক করাই হচ্ছে আমার পেশা, এবং আমার লেখার ভিতর যদি কোনরূপ কৌশল থাকে ত সে হচ্ছে সহাস্য তর্ক করবার কৌশল। সম্ভবত ঐ হাসির আবরণই অনেককে তর্কিত বিষয়ের স্বরূপ দেখতে দেয় না। সকল দেশেই এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁদের বিশ্বাস, যে-কথা গম্ভীর ভাবে বলা হয় নি, সে-কথার ভিতর কোনো গুরুত্ব নেই। যে-কথা চোখের জলে ভিজে নয় তার ভিতর রস নেই। আমি ত কোন্ ছার,—যে অসামান্য প্রতিভাশালী লেখকের মতামত আজকের দিনে ইউরোপের দার্শনিক সমাজের মনের উপর প্রভুত্ব করছে সেই অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস্‌কে তাঁর ক্লাসের একটি ছাত্র একদিন জিজ্ঞাসা করে "Can't you ever be serious"? বলা বাহুল্য সে সময়ে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের লেকচার দিচ্ছিলেন।

এ সব কথা শুনে অনেকে হয়ত মনে করবেন যে, এ সব কথা আমি সাহিত্যসমাজে সাফাই হবার জন্যে বলছি এবং প্রকারান্তরে আত্মপ্রশংসা করছি। এর উত্তরে আমার নিবেদন এই যে, পরনিন্দা করবার চাইতে আত্মপ্রশংসা করা ঢের বেশি নিরাপদ। নিজের প্রশংসা নিজে করলে কেউ তা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু পরের নিন্দা করলে কেউ তা অবিশ্বাস করবে না। কিন্তু সত্য কথা এই যে, আমরা কি বলি, তার চাইতে তা আমরা কি করে বলি,—তার মূল্য কম

ত নয়ই, বরং অনেক বেশি। আজকের মতামত যে কাল টেঁকে না তার প্রমাণ ত ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছাপা রয়েছে। মানুষের জ্ঞানের সম্পদ দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, সুতরাং এক যুগের স্বল্প-জ্ঞানের উপর যে মতামত প্রতিষ্ঠিত পরযুগের প্রবুদ্ধজ্ঞানের আলোকে তার হীনাঙ্গতা ধরা পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হেগেলের দর্শন ইউরোপের মনের উপর কি রকম একাধিপত্য স্থাপন করেছিল তা সকলেই জানে। আর আজ সে দর্শনের কি দশা! সে দিন ষ্টেইন নামক জনৈক জর্ম্মান দার্শনিকের গ্রন্থে পড়লুম যে, এ যুগে হেগেলের গ্রন্থ কোনো জর্ম্মান দার্শনিক স্পর্শ মাত্রও করে না। ও হাড় নাকি জর্ম্মানির দার্শনিক সমাজের কোন কুকুরেও চিবয় না'! অপর পক্ষে প্লেটোর দর্শন অদ্যাবধি সকল দার্শনিকই শ্রদ্ধাভরে, ভক্তিভরে, সানন্দে ও সোৎসাহে পাঠ করেন। এর কারণ কি? প্রথমেই চোখে পড়ে যে Style-এর গুণে প্লেটোর দর্শন মানুষের চির-আনন্দের অতএব চির-আদরের সামগ্রী হয়ে রয়েছে, আর Style-এর দোষে হেগেলের দর্শন চিরদিনই কষ্টপাঠ্য ছিল, এবং যখন তাঁর মত অগ্রাহ্য হল, তখন তাঁর গ্রন্থ যথার্থই অপাঠ্য হয়ে পড়ল। এক কথায়, হেগেলের মতের পিছনে কোনো বড় মন নেই—আর প্লেটোর মতের পিছনে যে-মন আছে তার সৌন্দর্য্যের ও ঐশ্বর্য্যের কোনোই সীমা নেই। এই কারণে প্লেটোর দর্শন সাহিত্য, আর হেগেলের দর্শন হয় বিজ্ঞান, নয় ত কিছুই নয়।

এই সব দেখে শুনে এ কথা বলতে সাহস হয় যে, সাহিত্য হচ্ছে সেই বস্তু যার অন্তরে কোনো বিষয়ের নয়, মানুষের মনের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এবং সে মন যত মহৎ, যত সুন্দর, যত শক্তিশালী হবে

তার প্রকাশও তত উজ্জ্বল, তত মনোহারী হবে। সাহিত্য মানুষকে কোনও বাহ্যবস্তুর জ্ঞানের শিক্ষা দেয় না। যাঁদের মন বড়, তাঁরা তাঁদের মনের মহত্ব আমাদের সকলেরি মনে অল্পবিস্তর সঞ্চারিত করে দিতে পারেন; এই কারণে মানুষে যত কিছু করেছে, সাহিত্যের স্থান সে সবের উপরে। কবিই হচ্ছে মানুষের যথার্থ ত্রাণকর্ত্তা, কেননা তাঁর বাণী মানুষকে তার হৃদয়ের ও মনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে উদ্ধার করে।

আর এক কথা, সাহিত্যে যে মানুষের মনের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, সাহিত্যে এবং একমাত্র সাহিত্যেই মানুষের পূর্ণ মনের পরিচয় পাওয়া যায়—অপর পক্ষে যাকে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান বলি তাতে মানুষের শুধু বুদ্ধিবৃত্তিরই খেলা দেখতে পাওয়া যায়। সকলেই জানে যে জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্ট যে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন তার একখানির বিষয় ছিল pure reason, আর একখানির practical reason, আর একখানির Æsthetic judgment, অর্থাৎ তিনি প্রথমে সত্যাসত্য জ্ঞানের, তার পরে ভালমন্দ জ্ঞানের এবং সর্ব্বশেষে সুন্দর অসুন্দরের জ্ঞানের বিচার করেন। বলা বাহুল্য মানুষের অন্তরে এ কটি স্বতন্ত্র শক্তি নয়—আমরা যাকে মন বলি তার ভিতর এ তিনটি শক্তি একটি শক্তিরই ত্রিমূর্ত্তি। আমাদের মন যখন কোনো বিষয়ের সংস্পর্শে আসে তখন সেটিকে আমরা আমাদের সমগ্র মন দিয়ে—হয় চেপে ধরি, নয় ঠেলে দিই এবং তার সত্যতা, তার উপাদেয়তা, তার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমাদের আত্মা একযোগে রায় দেয়। বিষয় বিশেষের স্পর্শে যাঁর সমগ্র মন সাড়া দেয় এবং যিনি সেই সমগ্র মনের জীবন্ত ছবি বাণীর সাহায্যে লোকের

চোখের সুমুখে ধরে দিতে পারেন তিনিই যথার্থ সাহিত্যিক অতএব যথার্থ সাহিত্য একাধারে দর্শন বিজ্ঞান এবং আর্ট।

আর এক কথা, আমরা সকলে মানুষ হলেও সকলেই এক প্রকৃতির মানুষ নই। আমাদের কি দেহ কি মন কি চরিত্র কিছুই আর এক ছাঁচে ঢালাই হয় নি। তারপর শিক্ষা দীক্ষার গুণে অভ্যাসের বশে কতকটা অবস্থার প্রভাবে কতকটা স্বীয়কর্ম্মের ফলে আমাদের এই জন্মসুলভ বিশেষত্ব হয় ফুটে ওঠে, নয় চেপে যায়। সুতরাং সকল বিষয়ের সংস্পর্শে আমাদের সকলের মন সাড়া দেয় না, এবং যাদেরও দেয় তাদেরও একভাবে দেয় না। যাঁর বাণীর অন্তরে একটি বিশেষ মনের বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর লেখাই সাহিত্য, এবং এই কারণেই সাহিত্যে style-এর মাহাত্ম্য এত বেশি, কেননা style-এর যথার্থ অর্থ হচ্ছে মানুষের আত্মপ্রকাশের নিজস্ব ভঙ্গী, সাহিত্যের বিষয় ত হচ্ছে একটা উপলক্ষ্য মাত্র। মানুষের মনও বিভিন্ন এবং তার প্রকাশের ভঙ্গীও বিচিত্র, সে কারণ সাহিত্যের বৈভব এবং বৈচিত্র্যও এত অসীম। আমার এসব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে জাতীয় সাহিত্য বলে কোনো পদার্থই নেই, আছে—শুধু নানা জাতীয় সাহিত্য, কেননা যে সব লোকের ব্যক্তিত্ব শিক্ষা দীক্ষার গুণে এবং আত্মচেষ্টার ফলে ফুটে ওঠে তাঁরা সত্য সত্যই পরস্পর বিভিন্ন জাতের মানুষ হয়ে ওঠেন।

দেখতে পাচ্ছ ঘুরে ফিরে আবার সেই individualism-এরই গুণকীর্ত্তন করছি—যার নাম শুনলে আঁতকেওঠা এদেশে পেট্রিয়টিজমের একটা প্রধান নিদর্শন, কিন্তু কি করা যাবে? ও কথা বলা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। আমাদের সকলেরই যদি, এক জ্ঞান, এক ধ্যান

এক মত, আর এক ভাষা হত, তাহলে আমাদের হাত থেকে যে সাহিত্য বেরত, তা এক কলে তৈরি জিনিষের মত সব এক আকার এক বর্ণ এক মাপ এক মূল্য হত। বলা বাহুল্য সে অবস্থায় আমাদের একাধিক গ্রন্থ পড়বার কোনো প্রয়োজন থাকত না। পড়বার কথা দূরে থাক লেখবার কোনো প্রয়োজন থাকত না, কেননা কেউ এমন কোন কথা বলতে পারতেন না, যে কথা সকলের কথা নয়। এ অবস্থা অবশ্য খুব আরামের অবস্থা, কেননা ও অবস্থায় মনের কোন খাটুনিই থাকত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ পৃথিবীতে যা কিছু শ্রেয়, এমন কি যা কিছু প্রেয়, তার রচনার ভিতরও আরাম নেই, ধারণার ভিতরও আরাম নেই। ইহজীবনে মানুষের দুটি শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় হচ্ছে—সত্যকে সুন্দর করে তোলা, আর সুন্দরকে সত্য করে তোলা এবং এ দুই বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করতে হলে, অল্পবিস্তর সাধনার আবশ্যক। সুতরাং সাহিত্য রচনার জন্য রচয়িতার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ করা, অর্থাৎ—নিজের ব্যক্তিত্ব বিকসিত করে তোলা। Pericles এর যুগে আথেন্সের এবং এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ডের সাহিত্যের বৈভব এবং বৈচিত্র্য যে এত বেশি, তার কারণ এ উভয় যুগে উভয় দেশেই বহু লোকের ভিতর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ স্ফূর্ত্তিলাভ করেছিল। অপর পক্ষে গত পঞ্চাশ বৎসরের জর্ম্মানীর সাহিত্যের যে কোনো ঐশ্বর্য্য নেই তার একটি প্রধান কারণ জর্ম্মানীর ইম্পিরিয়াল শাসন এবং জর্ম্মানীর ইম্পিরিয়াল শিক্ষা দেশশুদ্ধো লোকের মন ও চরিত্র একই ছাঁচে ঢালাই করতে চেষ্টা করেছিল এবং জর্ম্মানীর দুর্ভাগ্যক্রমে সে চেষ্টায় বহু পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েছিল। আমাদের সমাজ-শাসন এবং আমাদেরও শিক্ষাদীক্ষা মানুষের individualism-

এর স্ফূর্ত্তির মোটেই অনুকূল নয়, সুতরাং আমাদের ভবিষ্যৎ সাহিত্যের উন্নতির জন্য আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যকে individualism-এর স্বপক্ষে লড়াই করতেই হবে। অর্থাৎ—বিষয়কে গৌণ করে বিষয়ীকে মুখ্য করে তুলতে হবে।

বীরবল।

পুনশ্চ—

এ প্রবন্ধ বহুদিন পূর্ব্বে লেখা হয়েছিল, যখন লেখবার কোন নতুন বিষয় ছিল না। যদি নতুন বিষয় চাও ত আজকের দিনে তার ত কোন অনাটন নেই। আমি একটা ছোট ফর্দ্দ ধরে দিচ্ছি, তার ভিতর থেকে যেটা খুসি তুমি বেছে নিতে পার।

১। Einstein-এর আবিষ্কার। আকাশের উঠোন বাঁকা, না আলোর চলন বাঁকা, এই সমস্যার আশ্রয়ে হরেকরকম দার্শনিক আকাশ-কুসুম রচনা করা যেতে পারে।

২। Marconi-র কাছে তারা থেকে বে-তার তার আসছে। এ তার পাঠাচ্ছে কে, দেবতারা, না যারা যুদ্ধে মরে জ্যোতির্ল্লোকে গিয়েছে? যুদ্ধে মরলেই যে মানুষ স্বর্গে যায় এ কথা ত সকল শাস্ত্রেই বলে। অতএব নক্ষত্রলোক হতে আগত টরেটক্কার অর্থ নিয়ে দেদার কল্পনা খেলানো যেতে পারে।

৩। যদি এই সব বিশ্বসমস্যা নিয়ে মাথা বকাতে না চাও ত Khalifate নিয়ে অনেক কথা বলতে পারো—যার ভিতর ঐহিক পারত্রিক সকল বস্তু মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে,

অর্থাৎ কলমের ঝাঁটানে সসীমকে অসীম আর ডানটানে অসীমকে সসীম করতে পারবে।

৪। ওর চাইতে যদি নিরীহ বিষয় চাও তাহলে সুমুখেই ত Exchange পড়ে রয়েছে। রূপোর দর বাড়ে নি, সোনার দরও কমে নি, অথচ টাকার দাম যেমন বেড়েছে গিনির দাম তেমনি কমেছে। টাকা ও গিনির এই লুকোচুরি খেলা নিয়ে দেখ দেখি বুদ্ধি খেলাবার কি সুযোগ পাওয়া গেছে আর বলা বাহুল্য যে পৃথিবীতে হেন লোক নেই রজত-কাঞ্চনের এই মায়ার খেলায় যাকে মুগ্ধ না করবে।

আর যদি চাও ত উপরোক্ত চারিটি বিষয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে পারো, যেহেতু ও চারিটিরি গোড়ায় রয়েছে একটি মাত্র সমস্যা—ভূলোকে সঙ্গে দ্যু-লোকের যোগাযোগের রহস্য। আলো বেঁকে যায় কেন? Einstein বলেন মাটির টানে। দেবতারা পৃথিবীতে তার পাঠাচ্ছেন কেন? উত্তর একই, মাটির টানে। Khalifate সমস্যার মূলে কি আছে, ইউরোপের মাটির টান, সোনারূপো এক দেশ থেকে আর এক দেশে চলে যায় কেন?—মাটির টানে।

এর থেকে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, প্রথমে পৃথিবীতে যা ঘটে মানুষ যা করে তার মূলে আছে মাটির টান। দ্বিতীয় দ্যুলোক থেকে ভূলোকে যা কিছু আসে তা আলোকই হোক আর আকাশবাণীই হোক, সব বেঁকে যায়, সব বিগড়ে যায় ঐ মাটির টানে।

অতএব মানুষের কৃতীত্ব হচ্ছে সেই বস্তু সৃষ্টি করায়, যার উপর মাটির টান নেই, অর্থাৎ—আকাশকুসুম। ওবস্তু যে আমরা ভূলোক থেকে দ্যুলোকে পাঠাই।

বাপ ও ছেলে।

—ঃ০ঃ—

—"বাবা! বাবা! একটা গল্প বল।"

—"কিসের গল্প বাবা?"

—"এই—এই—এক্‌তা—এক্‌তা—বাগেল—এক্তবল বাঘেল—না, না, সেই কুমীলেল—সেই যে হাঁ ক'লে খেতে আসে।"

—"আচ্ছা,—এক যে ছিল কুমীর, সে করতো কি—না গর্ত্তের মধ্যে থাক্‌তো—"

—"না—না, গত্তেল মধ্যে নয়, তুমি জান না, জলেল মধ্যে। তালপল বলবো? শুন্‌বে? তালপল—তালপল—একদিন—এই যে সে—এই যে—একদিন—গত্তেল থেকে বেলিয়ে—সে—তালপল কি বাবা?"

—"তারপর সে দেখ্‌লে, একটা গরু—"

—"না—না, তুমি বল্‌চো কেন? আমি বল্‌বো। তালপল সে দেখ্‌লে—দেখলে—গলু—এক্‌তা গলু জল খাবো—না বাবা?"

—"হাঁ, হাঁ, লক্ষ্মী—কেমন গল্প শিখেচে আমার বাবা।"

স্নেহকাতর পিতা শিশুর কচি গাল দুটিতে বারবার চুম্বন করতে লাগলেন। পিতার এই অসাময়িক অর্থহীন দৌরাত্ম্য থেকে নিজেকে মুক্ত করে শিশু দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে বল্‌তে লাগ্‌লো!

—"তালপল—শোন না বাবা—না, তুমি শোন—তালপল, কুমীল আত্তে আত্তে—এম্‌মি ক'লে—আত্তে আত্তে না গিয়ে—আঁ—ক্।"

শিশু নিজেকে কুমীর এবং বাবাকে গরু করে পিতার হাত ধরে টান্‌তে লাগ্‌লো। পিতাকেও সহাস্যমুখে কুম্ভীর কবল গ্রস্ত গরুর মত ছট্‌ফট্ করতে হল কিন্তু ছেলে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে অভিমানের সুরে বল্‌লে—"তুমি কাঁদ বাবা কাঁদ—আঁ—আঁ—আঁ।"

—"গরু কি কাঁদতে পারে বাবা।"

—"হাঁ, পারে—কাঁদে।"

—"আচ্ছা, কাঁদ্‌চি—হাম্‌মা—"

—"গলু হাম্—মা বলে কাঁদে? গলুল মা কোথায় বাবা? হাঁসপাতালে? আবাল আস্‌বে?—আবাল গলুকে কোলে নিয়ে—হাম্—?"

মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছে নিয়ে তাড়াতাড়ি পিতাকে বলতে হল।

—"বাবা, কেমন ছবির বই!—কেমন ভাল ভাল ছবি!"

—"কৈ বাবা? কৈ? দেখবো।"

—"এই যে, এই দেখ—এই অজগর সাপ—এই ঈগল পাখী—"

—"এই উত্"।

—"হাঁ হাঁ—এই উট আর এই এক্‌কা গাড়ী"।

—এক্‌কা গালী খুব ছুটেছে"।

—"লক্ষ্মী, লক্ষ্মী—সব জানে বাবা আমার—এই গুল—এই—"

পিতা তাড়াতাড়ি পাতা উল্‌টে গিয়ে বল্লেন—"এই ক'য় কুকুর"

—"না কুকুল না—ঐ যে তুমি দেখালে না—ঐ যে ওলেল পল—"

—"ও কিছু না"।

অভিমানী ছেলে ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে বাপের দিকে একটি ছোট মুঠো তুলে বল্লে—"মাল্‌বো"।

বিপদ্‌গ্রস্ত পিতা বলে উঠ্‌লেন "বাবা, এই দেখ—উঃ কত বড় সিংহ—কত বড় কেশর"।

"—না ছিংহ না" মাটিতে শুয়ে পড়ে নির্ম্মমভাবে বইখানার উপর লাথি ছুড়্‌তে ছুড়্‌তে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বাপের কোলে মুখ লুকালো।

মা ছেলেকে অসুধ খাওয়াচ্চে এ ছবি কি সে না দেখে থাক্‌তে পারে? যে তার মা-ই তাকে কতবার দেখিয়েচে—সে জানে ও তার মায়েরই ছবি—অমন লম্বা চুল, অমন গয়না কাপড়—আর কোন্ স্ত্রীলোকের আছে! তার মা-ই যে তাকে কতবার পাছড়ে কোলে ফেলে কাল-মেঘের রস খাইয়েচে।

বইখানাকে টেনে নিয়ে এসে পিতা বল্লেন—"আচ্ছা কেঁদোনা বাবা, দেখাচ্ছি" শিশু লাফিয়ে কোলের উপর উঠে বসলো। একটু-খানি দেখিয়েই তিনি আবার পাতা ওল্টাতে যাচ্ছিলেন কিন্তু শিশু তার গোল গোল কচি হাত পাতার উপর চাপা দিয়ে বল্লে—

—না, দেখি বাবা—মাকে আমি ভাল কলে দেখি"—

সে আজ কতকাল মাকে দেখে নি—কতদিন—কতমাস।

টস্ করে এক ফোঁটা গরম জল পিতার চোখ থেকে বইয়ের উপর পড়লো, তাড়াতাড়ি সেটাকে মুছে নিয়ে, ছেলেকে আরো ভাল করে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লেন—

—"হয়েচে ত বাবা ছবি দেখা? এইবার বন্ধ করে রাখি—কেমন"?

ছেলে কোন উত্তর দিলে না—বিষাদ গম্ভীর মুখে শুধু বল্লে—

"বাবা, আমি ঘুমুবো—তোমার কোলে শুয়ে"।

তার শরীর ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়েচে।

কোলে শুইয়ে তাকে নাচাতে নাচাতে পিতা বল্লেন—তুমি চোখ বোজ বাবা, আমি ঘুমপাড়ানো গান গাই— ঘুমপাড়ানী মাসী পিসি আমাদের বাড়ী এসো—খাট নেই, চৌকি নেই—

"না বাবা, সেইটে—এ ধন যাল ঘলে নেই তাল"—

"ধন, ধন, ধন—আমার বাড়ীতে ফুলের বন—এ ধন যার ঘরে নেই তার বৃথাই জীবন—তারা কিসের গরব করে—তারা—"

আর গাইতে হল না—পিতা দেখ্‌লেন—শিশুর নিশ্বাস স্থিরভাবে পড়্‌চে—সে ঘুমিয়েচে। একদৃষ্টে তার চাঁদমুখখানির দিকে চেয়ে তিনি কার সাদৃশ্য তাতে দেখছিলেন কে জানে? কতক্ষণ নিশ্চলভাবে পাষাণে-গড়া মূর্ত্তির মত বসেছিলেন—সহসা চম্‌কে উঠে শুনলেন, শিশু ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলচে—

"আমি আলো অসুদ খাবো—আমি আল কাঁদব না।"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

রায়তের কথা।

—:০:—

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

সুহৃদ্বরেষু—

বাঙলার নতুন কাউন্সেলের নতুন ইলেকসানের জন্যে কি প্রোগ্রাম হাতে নিয়ে লোকের সুমুখে আমাদের খাড়া হওয়া কর্ত্তব্য সে বিষয়ে তুমি আমার মত জানতে চেয়েছ। এ কথা শুনে লোকে হাসবে। এক-জন সখের সাহিত্যিকের কাছে কাজের পলিটিক্সের পরামর্শ চাওয়াটা সখের দলের পলিটিসিয়ানদের কাছে নিশ্চয়ই কামারের দোকানে দইয়ের ফরমায়েস দেওয়ার মত হাস্যাস্পদ ব্যাপারহিসেবে গণ্য হবে। তবুও তোমার অনুরোধ আমি রক্ষা করতে প্রস্তুত হয়েছি। কারণ কি জানো?—এ যুগের পলিটিক্সে অধিকারীভেদ নেই। ডিমো-ক্রাসীর অর্থই কি এই নয় যে, রাজনীতি সম্বন্ধে সকলের সব রকম কথা কইবার সমান অধিকার আছে? এ ক্ষেত্রে লোকমত ত বেদবাক্য! আর অসংখ্য "আমার মতকে" ঠিক দিয়েই ত "আমাদের মত" পাওয়া যায়। এ হিসেবে আমারও মুখ খোলবার অধিকার আছে।

আর এক হিসেবে আমি বলতে পারি যে, তুমি এ ক্ষেত্রে ঠিক লোকের কাছেই এসেছ, কেননা আমি আমার কথা বাঙলায় বলতে

পারি। রিফরম বিলের ফল কি হল না হল, আর কি হবে না হবে—এ সব বিষয়ে ঢের মতভেদ থাকলেও এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই আইনের বলে আমাদের রাজনীতির ভাষা একদম বদলে গেল। এতদিন সে ভাষা ছিল রাজার, এবার হল তা প্রজার। ষোলআনার মধ্যে পোনেরোআনা ভোট যখন প্রজার হাতে তখন সে ভোট আদায় করতে হলে মাতৃভাষারই শরণাপন্ন হতেই হবে। ভিক্ষাটা, ভিক্ষাদাতার ভাষাতেই করতে আমরা বাধ্য; এই কারণেই ত সে ভাষা জানি আর না জানি—আমরা এ-যাবৎ আমাদের রাজনৈতিক আরজি-দরখাস্ত সব ইংরাজিতেই করতে বাধ্য হয়েছি। এখন থেকে দরখাস্ত যখন বাঙলা-তেই লিখতে হবে তখন যার ও-ভাষার কলম হাতে আছে তাকে বাদ দিয়ে পলিটিক্স করা আগেকার মত আর চলবে না। আর আমি যে বাঙলা জানি সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই, কেননা আমার লেখা পড়ে লোকে বলে আমি সংস্কৃত জানি নে। হাল পলিটিক্স সম্বন্ধে কথা কইবার বিশেষ অধিকার যে আমার আছে এই হচ্ছে তার প্রথম দলিল। আর যে সব দলিল আছে তা ক্রমে পেশ করছি।

(২)

কেন প্রোগ্রাম চাই।

তুমি ঠিক ধরেছ যে এ-ফেরা আমাদের যা-হোক্ একটা প্রোগ্রাম চাই-ই চাই। ইতিপূর্ব্বে যে সব ইলেকসান হয়ে গেছে তাতে প্রোগ্রামের কোনই আবশ্যকতা ছিল না। ভোটারের সংখ্যা ছিল দশ বিশটি আর সে ভোট যে যাঁর খাতির রাখে তিনি তাঁকে দিতেন। মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বাররা দেখতেন ভোটপ্রার্থী

লোকটা কে; তাঁর মতটা কি, সে কথা কেউ জিজ্ঞাসা করত না। পূর্ব্বের ইলেকসান ছিল একরকম সামাজিক ব্যাপার, এমন কি সে ব্যাপারকে পারিবারিক বললেও অসঙ্গত হয় না, কেননা আমাদের দেশের পরিবার শুধু আত্মীয় স্বজন নিয়ে নয়, তার ভিতর আশ্রিত অনুগত লোকও ঢের থাকে। উকিল মোক্তার যেখানে ভোটার সেখানে জমিদারের সাহায্য ব্যতীত জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভোট আদায় করা কোনো অ-জমিদারের পক্ষে এক রকম অসম্ভব ছিল, তা তিনি যতই বিদ্বান বুদ্ধিমান, যতই স্বদেশী ও "স্বরাজী" হোন না কেন। তোমার মনে থাকতে পারে যে গত ইলেকসানে, একটি জমিদার ভোটারের দল ভোটপ্রার্থী কি জাত সেই হিসেবে নিজেদের ভোট দেন। ফলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাণ্ডিডেটকে হারিয়ে রাঢ়ী কায়স্থ কাণ্ডিডেট পদভরে মেদিনী কাঁপিয়ে লাট সভায় ঢুকে গেলেন। বলা বাহুল্য এ দলে বেশির ভাগ ভোটার ছিল রাঢ়ী কায়স্থ।

কিন্তু রিফরম বিলের প্রসাদে ভোটারের সংখ্যা যখন দশ-লাখের উপর উঠে গেছে, তখন আর ইলেকসানের মামলা পারিবারিক ভোটে ফতে করা চলবে না। সুতরাং প্রোগ্রাম চাই।

প্রোগ্রাম চাই দু কারণে। এই নতুন ভোটারের দল প্রায় সবাই নিরক্ষর। পলিটিক্সের "প" অক্ষর তাদের কাছে হয় গোমাংস, নয় হারাম। তুমি অবশ্য জানো যে এই অশিক্ষিত জনসাধারণকে ভোটের অধিকারী করবার বিরুদ্ধে প্রধান কারণ দেখান হয়েছিল তাদের এই শিক্ষার অভাবটা, বাঙালী স্ত্রীলোকের দেহের মত, যাদের মনের পক্ষে "ঘর হতে আঙিনা বিদেশ", তাদের হাতে ব্যবস্থাপক

সভার সদস্য নির্ব্বাচন করবার ভার দেওয়াটা যে প্রহসন মাত্র এ কথা দেশী বিদেশী, সরকারী বে-সরকারী অনেক লোক অনেক ভাবে বলেছেন, কেউ চটে কেউ হেসে, কেউ ধীরে কেউ জোরে। এ আপত্তির সার্থকতা আমি অবশ্য কখনো দেখতে পাই নি। গভর্ণমেণ্ট বলতে কি বোঝায়, গভর্ণমেণ্টের কটি সেরেস্তা আছে, প্রতি সেরেস্তার গঠন কি, কার অধীনে থেকে কি নিয়মে প্রতি সেরেস্তার কাজ চালাতে হয় এবং নানা বিভিন্ন সেরেস্তার আভ্যন্তরিক যোগাযোগটা কি, এ সব না জানলে যদি রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে মত দেবার অধিকার না থাকে ত বাঙলা দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরও সে অধিকার নেই। অধিকার নেই যে কেন তা শুনবে?—দু'বছর আগে পর্য্যন্ত কলিকাতার ল-কলেজে Constitutional Law পড়াবার ভার আমার হাতে ছিল। আমার ক্লাসে প্রতি বৎসর গোণাগাঁথা তিনশ' করে ছাত্র জড় হত এবং এরা প্রত্যেকেই হয় B. A., নয় B. Sc., অর্থাৎ—যুগপৎ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। এই অধ্যাপনাসূত্রে আমি কি আবিষ্কার করি জানো?—আমি নিত্য পরিচয় পেতুম যে এই ছাত্রদের মধ্যে অনেকে Legislative Council-এর সঙ্গে Executive Council-এর প্রভেদ যে কি সে বিষয়ে ওয়াকিব হাল নন। এ কথা তুমি সহজে বিশ্বাস করতে চাইবে না, কেননা কোনো আইনজ্ঞ লোকের পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন। নিজের অজ্ঞতা যদি গোপন রাখতে হয় তাহলে "শতং বদ মা লিখ" এই পরামর্শ মেনে চলতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ভদ্রসন্তানদের সে পন্থা অবলম্বন করবার ত উপায় নেই। এগজামিন আমাদের দিতেই হবে, লিখিত প্রশ্নের লিখিত জবাব দিতে আমরা বাধ্য, এবং কার কত বিদ্যে তা মুখ খুললেই ধরা পড়ে।

আমি আজ বছর দুয়েক আগে একবার Constitutional Law-এর কাগজ পরীক্ষা করি। "ভারতবর্ষের আইন কে তৈরী করে" এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর শতকরা নব্বইটি ছাত্র দিতে পারে নি, তাতে কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হই নি, কেননা ছাত্রসাধারণের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে পাকা জবাব পাবার আশা আমি কোনো কালেই রাখি নে! মুখস্থজ্ঞান পত্রস্থ করতে গেলে কম বেশি গলদ হবেই হবে, বিশেষত সে জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ বিলেতি পুঁথিগত। কিন্তু কতকগুলি উত্তর পড়ে আমারও চক্ষুস্থির হয়ে গিয়েছিল।

একজন লিখেছেন "ভারতবর্ষের সব আইন মুনিঋষিরা তৈরী করে গেছেন এবং আজও সেই সব বাহাল রয়েছে" আর এক জনের বিশ্বাস যে "ইংলণ্ডের রাজা হিন্দুস্থানের বড় লাটকে যে সব চিঠি পত্র লেখেন, সেই সব চিঠিতে তিনি যে হুকুমজারি করেন সেই সব হুকুমই হচ্ছে এদেশের আইন"। আর একজনের উত্তর—"ব্রিটিশ ভারতবর্ষের আইন-কানুন তৈরী করে Native Prince-রা"। কিন্তু এঁদের সকলের মন ভারতবর্ষে আবদ্ধ নয়—এ দেশের আইন কর্ত্তার তল্লাসে বাঙলার নবীন ভাবুকদের কল্পনা "ভারতের নানা দেশ করিয়া ভ্রমণ", অবশেষে "উপনীত হয়েছিল হিমালয়শিরে"। শেষে দেখলুম একজন লিখেছেন, "ভারতবর্ষের আইন বানান নেপালের রাজা"।

এরকম সব গাঁজাখুরি জবাবের কারণ আমি জানি। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছেলে Constitutional Law-এর কোনো বই কখনো চক্ষেও দেখে নি, কেননা তারা জানে যে এ বিষয়ের কোনো জ্ঞান না থাকলেও তাদের পাশ আটকাবে না এবং পরে ওকালতিরও ঠেকা হবে না। কিন্তু এই সব উত্তরই প্রমাণ যে আমাদের দেশের

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে দেশের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কোনোরূপ স্পষ্ট ধারণা নেই, এ বিষয়ে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রায় সবাই এক পঙ্‌ক্তিতে। এ অবস্থায় শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি লাটসভায় বসবার অধিকারী হন তাহ'লে অশিক্ষিত সম্প্রদায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সেখানে বসাবার অধিকার কেন না পাবে? এদেশের জনগণ নিরক্ষর বলে যে ভোটের অধিকারী হতে পারে না, এ আপত্তি মণ্টেগু-চ্যাম্‌সফোর্ড রিপোর্টে অগ্রাহ্য হয়েছে। কি কারণে অগ্রাহ্য হয়েছে তার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ উক্ত রিপোর্টের ৮৫ হতে ৯১, এই দশ পৃষ্ঠার ভিতর পাওয়া যাবে। ঐ পাতাক'টি বাঙলায় অনুবাদ করে দিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু সে খাটুনি খাটবার অবসর আমার নেই। যাঁরা পলিটিক্সের ব্যবসা করেন তাঁদের ঐ দশ পৃষ্ঠা ঈষৎ মনোযোগ দিয়ে পড়তে অনুরোধ করি। এস্থলে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে রিফরমের স্রষ্টাদের মতে এই ভোটসূত্রেই জনগণ পলিটিক্সের শিক্ষা লাভ করবে, আর আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান কর্ত্তব্য হবে তাদের সে শিক্ষা দেওয়া, বই পড়িয়ে নয়—মুখে মুখে। অর্থাৎ—ইলেকসানের ক্ষেত্রেই হবে এ দেশের যথার্থ পলিটিক্যাল স্কুল, যেমন আদালতই হচ্ছে আইনের যথার্থ স্কুল।

জানই ত এ যুগের পলিটিক্সের গোড়ার কথা হচ্ছে প্রতি লোকের নিজের অধিকারের জ্ঞান। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ—একশ' আঠারো বৎসর আগে তখনকার ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট দেশের অবস্থা জানবার জন্য জিলার কালেক্টরদের কাছে কতকগুলি প্রশ্ন করে পাঠিয়ে দেন তার একটি প্রশ্ন ছিল এই—এদেশের প্রজাদের কি কি অধিকার আছে

এ প্রশ্নের উত্তরে মেদিনীপুরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্ট্রেচি সাহেব লেখেন :—

"অধিকার বলতে আমরা যা বুঝি, এদেশের জনসাধারণের কস্মিন্‌কালেও যে তা ছিল এরূপ বিশ্বাস আমার নয়। সত্য কথা বলতে গেলে, তাদের কোনোরূপ অধিকার নেই, কোনোরূপ স্বাধীনতা নেই। যদি কোথায়ও দেখা যায় যে তারা সুখ শান্তিতে বাস করছে তার অর্থ এ নয় যে, তাদের সুখে থাকবার কিম্বা শান্তিতে থাকবার কোনোরূপ অধিকার আছে। ও-দুই বস্তু হচ্ছে তাদের শাসনকর্ত্তাদের দত্ত বরস্বরূপ। শাসনকর্ত্তারা উচিত জ্ঞান কিম্বা স্বার্থজ্ঞানের বশবর্ত্তী হয়ে তাদের উপর যদি জুলুম জবরদস্তি না করেন তাহলেই তারা নিজেদের কৃতার্থ এবং অনুগৃহীত মনে করে"—(Fifth Report, Vol. II, page 596.)

এ কথা যে সত্য তা কে অস্বীকার করবে? একটু চোখ-চেয়ে দেখলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, আজকের দিনেও অধিকার সম্বন্ধে তারা যেখানে ছিল প্রায় সেখানেই আছে। আজও লক্ষ লক্ষ প্রাণীর জীবন-যাত্রা উপরওয়ালাদের অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করে। হুজুরের মেহেরবানি ও ধর্ম্মাবতারের অনুগ্রহের জন্য আজও এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক লালায়িত।

মানুষের এই অধিকারজ্ঞান আমাদের দেশে ভূঁইফুঁড়ে ওঠে নি, সাগরপার থেকে জাহাজে চড়ে এসেছে। মনুষ্যত্বের দাবী আমরা ইংরাজি শিক্ষার গুণে করতে শিখেছি। সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র পড়ে দেখ তাতে আছে শুধু কর্ত্তব্যের কথা, অধিকারের 'অ' পর্য্যন্ত তাতে নেই। মানুষমাত্রেরই অধিকারের কথা (Rights of man) ইউরোপেও সেদিন উঠেছে, এই ফরাসী-বিপ্লবের সময় থেকে। ও-জ্ঞান কোনো সমাজেই পুরাতন নয়। আমরা যে ভাবি ও-জ্ঞান সনাতন, তার কারণ আমরা

জন্মেছি ঐ জ্ঞানের আবহাওয়ার ভিতর, আর ইংরেজি স্কুলে ঢুকে পর্য্যন্ত ঐ বস্তু হয়েছে আমাদের মনের নিত্য নিয়মিত খোরাক। ইংলণ্ডের ইতিহাসের মত তার কাব্য সাহিত্যও স্বাধীনতার গন্ধে ভূরভূর করছে; সুতরাং ও-বস্তুর ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন আমাদের সবারই হয়ে গেছে।

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হবে জনসাধারণের মনে তাদের অধিকারের জ্ঞান ঢুকিয়ে এবং বসিয়ে দেওয়া। ওর থেকে পালাবার জো নেই, কেননা সে পালানো হবে আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য থেকে পালানো। কেউ কেউ অবশ্য বলবেন যে ও আমাদের মোটেই কর্ত্তব্য নয়, কেননা আমরা পরের জন্য ডিমোক্রাসি চাই নি, নিজেরা হতে চেয়েছিলুম স্বদেশী বুরোক্রাসি। পলিটিসিয়ানদের অনেকের নজর যে দেশের দিকে নয়, সিমলার উপর ছিল সে কথা আমরা জানি। সেই কথাটা স্পষ্ট করে বললে গোল ত চুকেই যেত।

"অচল বলিয়া উচল সেবিনু
পড়িনু অগাধ জলে"—

অবস্থাটা যদি সত্য সত্যই তাই হয়ে থাকে ত ভদ্রলোকের পক্ষে সে কথা চেপে যাওয়াই শ্রেয়। সুতরাং কি চেয়েছিলুম আর না-চেয়েছিলুম, তা নিয়ে হা-হুতাশ করা নিস্ফল। ঘটনা যা ঘটেছে তাতে চাষার ভোট দিন দিন বাড়বে বই কমবে না, সুতরাং পলিটিক্যাল হিসেবে লোকশিক্ষার ভার আমাদের হাতে নিতেই হবে। অতএব প্রোগ্রাম চাই।

(৩)

(অধিকার সামান্য ও বিশেষ)

এ পর্য্যন্ত বোধহয় আমরা সকলেই একমত। কিন্তু আর বেশি এগোবার আগে অধিকার কথাটার ঠিক মানে যে কি তা বোঝবার একটু চেষ্টা করা যাক। এ চেষ্টা ফুজুল নয়, কেননা কথাটা হচ্ছে দ্ব্যর্থবাচক।

আমি এই খানিকক্ষণ হ'ল বলেছি যে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে মানুষকে শুধু তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হয় আদেশ করা হয়েছে, নয়ত উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সে শাস্ত্রে ধর্ম্ম বলতে বোঝায় বিধি-নিষেধ-সম্বলিত বচন, অর্থাৎ—মানুষকে কি করতে হবে আর কি না করতে হবে, তাই জানানো হচ্ছে ধর্ম্মশাস্ত্রের কাজ। এক কথায় ধর্ম্মশাস্ত্র হচ্ছে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের শাস্ত্র।

সে শাস্ত্রে এই ধর্ম্ম আবার দু'ভাগে বিভক্ত। শাস্ত্রের ভাষায় দু-রকম ধর্ম্ম আছে, এক সামান্য ধর্ম্ম আর এক বিশেষ ধর্ম্ম। চুরি করো না, খুন করো না, পরদার হরণ করো না—এসব হচ্ছে সামান্য ধর্ম্মের কথা, কেননা এ সকল ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্ব্বিচারে সকলের পক্ষে সমান মান্য। অপর পক্ষে বেদপাঠ করা ব্রাহ্মণের ও ব্রাহ্মণের সেবা করা শূদ্রের বিশেষ ধর্ম্ম। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সামান্য ধর্ম্মের কথা এক রকম উহ্য রয়ে গিয়েছে। মেধাতিথি বলেন, যে-ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণ তার বিশেষ করে উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই, কেননা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সে-ধর্ম্ম সর্ব্বলোকবিদিত। অপর পক্ষে বাইবেলে যিশুখৃষ্টের সব উপদেশই সামান্য ধর্ম্মগত। টাকা ধার

নিলে, কি হারে সুদ দিতে হবে সে বিষয়ে যিশুখ্রীষ্ট সম্পূর্ণ নীরব। অর্থাৎ—আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র হচ্ছে আইন আর বাইবেল হচ্ছে নীতিকথা।

বলাবাহুল্য এই সামান্য ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্মের ভিতর দা-কুমড়োর সম্পর্ক নেই, এদুয়ের উপরই সভ্য সমাজের ভিত্তি। বাইবেলে বিশেষ ধর্ম্মের কথা উহ্য রয়ে গিয়েছে কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয় নি। কেননা যিশুখ্রীষ্ট এককথায় এ বিষয়ে সব কথা বলেছেন, "সিজারের প্রাপ্য তাঁকে দিয়ো", অর্থাৎ—আইন মেনে চলো।

তারপর কর্ত্তব্য ও অধিকার হচ্ছে দুটি আপেক্ষিক শব্দ। শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণের সেবা করা যদি কর্ত্তব্য হয় তাহলে শূদ্রের কান ধরে সে সেবা আদায় করবার অধিকার ব্রাহ্মণের নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং এ দু'-ই পরস্পর পরস্পরকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রাচীন সভ্যতা ও নব সভ্যতার ভিতর আসল প্রভেদ এই যে, সেকালে লোক একমাত্র কর্ত্তব্যটাই মানুষের চোখের সুমুখে খাড়া করে রাখত, একালে বিশেষ করে অধিকারটাই আমরা খাড়া করতে চাই।

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই কথাটা স্পষ্ট করা যে, কর্ত্তব্যের মত অধিকারও দুভাগে বিভক্ত, এক সামান্য অধিকার আর এক বিশেষ অধিকার। খুন করবার অধিকার যেখানে কারো নেই, বেঁচে থাকবার অধিকার সেখানে সবারই আছে, এই হচ্ছে মানুষের সামান্য অধিকারের প্রথম দফা। কিন্তু তুমি জান, আমি জানি আর সবাই জানে ফাঁসি দেবার, অর্থাৎ—মানুষের প্রাণবধ করবার বিশেষ অধিকার State-এর আছে, অর্থাৎ—সমাজ যখন প্রাণহিংসার বিশেষ অধিকার বিশেষ বিশেষ লোককে কিম্বা সম্প্রদায়কে দেয় তখন তা হয় বৈধহিংসা। অতএব

সামান্য অধিকারের কথাগুলো অনেক অংশে ফাঁকা, মস্ত হলেও ফাঁপা।

এখন আমার কথা এই যে মানুষের পক্ষে তার বিশেষ অধিকারের জ্ঞানটাই হচ্ছে তার পক্ষে সবিশেষ দরকারী। মানুষের সঙ্গে মানুষ মাত্রেরই একটা দূর সম্পর্ক অবশ্য আছে কিন্তু প্রতি লোকের, কোনো কোনো বিশেষ লোকের সঙ্গে যে বিশেষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাই নিয়েই তার জীবন। বাপ ও ছেলে, স্বামী ও স্ত্রী, মুনিব ও চাকর, এদের পরস্পরের ভিতর কর্ত্তব্য ও অধিকারের নানা রকম বিশেষ বন্ধন আছে। এবং সেই সব অধিকারের উপর দাঁড়িয়েই সামাজিক লোকে সংসার চালায়। এ স্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক। মোটামুটি ধরতে গেলে এ সব ক্ষেত্রে যে প্রবল, অধিকারটা বেশি করে তার হাতেই থাকে আর যে দুর্ব্বল কর্ত্তব্যটা বেশি করে তার ঘাড়েই পড়ে। আর এই দেনা-পাওনার হিসেবটা যতদূর সম্ভব দু-দিকে সমান করে নিয়ে আসাটা এ যুগের পলিটিক্সের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য।

অতএব জনসাধারণের মনে প্রধানত তাদের বিশেষঅধিকারের জ্ঞান জন্মিয়ে দিতে হবে এবং সামান্য অধিকারের কথা সেই স্থলেই পাড়তে হবে যেখানে আমরা তাদের অধিকার বাড়াতে চাইব। যা আছে সেই টুকুকে শুধু রক্ষা করার অর্থ স্থিতি, উন্নতি নয়। কিন্তু আমরা সবাই উন্নতি চাই, এ-ও হচ্ছে এ যুগের মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা। বিশেষ অধিকারের নিঃসম্পর্কিত সামান্য অধিকারের ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে জনসাধারণকে ভোগা দেওয়া। সে দিন কংগ্রেস মানুষ মাত্রেরই সামান্য অধিকারের ফর্দ্দ ধরে দিয়েছেন। পলিটিসিয়ানরা যদি দেশের

লোকের কাছে সেই ফর্দ্দ পড়তে সুরু করেন তাহলে বোঝা যাবে যে তাঁরা চাষা-ভুষোকে কোনো বিশেষ অধিকার দিতে নারাজ। যাতে সকলের সমান অধিকার আছে তাতে কারো কোনো বিশেষঅধিকার না-ও থাকতে পারে।

(৪)

(দেশের অবস্থা)

তার পর প্রশ্ন ওঠে দেশের লোককে পলিটিক্যাল শিক্ষা দেবার সদুপায় কি ?

বই পড়ানো যে নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে কি আমাদের পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক দর্শন অথবা রাজনৈতিক বিজ্ঞানের লেকচার দিতে হবে ? তাও অবশ্য নয়। কেননা ও-সব জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ব করা দরকার—B.A., M.A., পাশ করবার জন্যে এবং কলেজের প্রফেসারি করবার জন্যে। ও-জ্ঞান জীবনযাত্রার পাথেয় নয়, অন্তত চাষাভুষোর পক্ষে ত নয়ই। তাদের অবস্থানুযায়ী অধিকারের কথা চাপা দিয়ে, তাদের কাছে rights of man-এর ব্যাখ্যান করার অর্থ গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া। বিশেষ অধিকারের মূল থেকেই যে সামান্য অধিকারের ফুল ফুটেছে, এ কথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কে না জানে ? তা ছাড়া এ শাস্ত্রের বড় বড় কথা প্রচার করবার ভিতর বিপদও আছে। জনগণ হয় সে সব বুঝবে না, নয় উল্টো বুঝবে আর তখন আমরা তাদের উপর হাত চালাতে প্রস্তুত হব।

এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে কিংকর্ত্তব্য ? উত্তর খুব সোজা।

মানুষের বিশেষ অধিকারসকল তার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং তার স্বার্থ যে কোথায় এবং কি উপায়ে সেই স্বার্থের রক্ষা ও বৃদ্ধি করা যেতে পারে, সেই জ্ঞান দান করতে পারলেই আমরা তাদের পলিটিক্যাল শিক্ষা দান করতে পারব। আপনার কড়াগণ্ডাটা বুঝে নেবার ক্ষমতাটাও মানুষের একটা শক্তি, আর শক্তিই হচ্চে সকল উন্নতির মূল। কেবলমাত্র জনসাধারণের দিক থেকে নয়, সমগ্র জাতির দিক থেকে দেখলেও, যাতে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হয় সেই চেষ্টা করাটাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হবে। আদমসুমারিতে জনসাধারণই হচ্ছে অসংখ্য আর অসাধারণ জন, অর্থাৎ—ভদ্রলোকের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়। আর যে জাতির বেশির ভাগ লোক দুর্দ্দশাপন্ন সে জাতির কি শরীরে কি অন্তরে কোনো শক্তিও নেই, কোনো উন্নতির আশাও নেই।

সুতরাং রাজনৈতিক ভাবের বিলেতি আকাশ থেকে বাঙলার মাটিতে নেমে এসে দেখা যাক্, সে দেশের অবস্থাই বা কি আর দেশবাসীদেরই বা অবস্থা কি ? অবস্থা বুঝলে ব্যবস্থা করবার সুবিধে হবে। আমরা সকলে লাটদরবারে ঢুকতে চাচ্ছি শুধু যে উচিত ব্যবস্থা করবার জন্য, তা সে দরবারের নামেই প্রকাশ। কে না জানে সে সভার নাম ব্যবস্থাপক সভা।

ছেলেবেলায় কথামালায় পড়েছিলুম যে জনৈক বৃদ্ধ কৃষক তার ছেলেদের ডেকে বলেন যে তার ক্ষেতে ধনরত্ন পোঁতা আছে। সেই ধনরত্নের লোভে তার ছেলেরা সেই ক্ষেত আগাগোড়া খুঁড়ে ওলটপালট করলে ; কিন্তু পোঁতাধনের কোথায়ও সাক্ষাৎ পেলে না, তবে এই খোঁড়ার ফলে এই ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত ফসল জন্মাল।

আমাদের বাঙলা দেশ হচ্ছে ঐ রকমের একটি প্রকাণ্ড কৃষকের ক্ষেত্র, ওর বুকের ভিতর কোনো গুপ্তধন পোঁতা নেই, ও-ক্ষেত্রে শুধু ফসল জন্মায়। বাঙলা দেশ যে সোনার খনি নয়, এ বলে কোনো দুঃখ করবার দরকার নেই, কেননা আবাদ করতে জানলে এ জমিতে আমরা সোনা ফলাতে পারি। আর খনির সোনা দু'দিনেই ফুরিয়ে যায়, কিন্তু আবাদের সোনা অফুরন্ত ও চিরদিন ফলে।

বাঙলা দেশ যে শস্যক্ষেত্র এই সত্যের উপর আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে হবে। বাঙলার উন্নতি মানে কৃষির উন্নতি। এ উন্নতি অনেকে সাধন করতে চান জমিতে সার দিয়ে! তাঁরা ভুলে যান যে কৃষকের শরীর-মন যদি অসার হয় তাহলে জমিতে সার দিয়ে দেশের শ্রী কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমাদের দেশে যা দেদার পতিত রয়েছে সে হচ্ছে মানব জমিন আর আমরা যদি স্বদেশে সোনা ফলাতে চাই তাহলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য হবে এই মানব জমিনের আবাদ করা। এবং তার জন্য দেশের জনসাধারণের মনে রস ও দেহে রক্ত—এ দু-ই জোগাবার জন্য আমাদের যা-কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, যা-কিছু মনুষ্যত্ব আছে তার সাহায্য নিতে হবে। এখন আসল কথায় ফিরে আসা যাক্। আগামী ইলেকসানের জন্য সেই প্রোগ্রাম তৈরী করতে হবে, যার উদ্দেশ্য হবে, বাঙলার কৃষকের ওরফে বাঙলী জাতির অবস্থার উন্নতি করা। একটা সমগ্রজাতির দুরবস্থা দূর করা যে কঠিন, এবং তা করবার সকল উপায় যে আমাদের হাতে নেই একথা আমি সম্পূর্ণ জানি। আমি শুধু বলি যে, যেটুকু আমাদের সাধ্যের অতীত নয়, সেইটুকু করবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে কেননা সে চেষ্টার ফল ভাল না হয়ে যায় না।

(৫)

(কৃষকের অবস্থা)

ইলেকসানের প্রোগ্রাম অবশ্য পলিটিসিয়ানদেরই তৈরী করতে হবে, কেননা দেশ উদ্ধারের ভার তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। অতএব কৃষকের অবস্থার যাতে উন্নতি হয় সেই মর্ম্মে প্রোগ্রাম তৈরী করা অবশ্য আমাদের পলিটিসিয়ানদের পক্ষেই কর্ত্তব্য। তাঁদের নিজের স্বার্থের দিক থেকে দেখলেও এ কর্ত্তব্য তাঁরা অবহেলা করতে পারবেন না। গাঁয়ে যাঁকে মানে না তাঁর পক্ষে দেশের মোড়লি করা আর চলবে না। তবে এ প্রোগ্রাম তাঁরা তৈরী করতে পারবেন কি না সন্দেহ।

আমি না হই তুমি যখন আধ আধ কথা কইতে, সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র অতি স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে :—

"জমিদারের ঐশ্বর্য্য সকলেই জানেন, কিন্তু যাঁহারা সংবাদপত্র লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া বঙ্গসমাজের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বেড়ান তাঁহারা সকলে কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন"—

বঙ্কিমের যুগে পলিটিসিয়ানদের অজ্ঞতার যা পরিমাণ ছিল ইতিমধ্যে তা যে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য, কেননা ইতিমধ্যে বাঙলার ভদ্রলোকের দল জমি থেকে ঢের বেশি আলগা হয়ে পড়েছে। এখন এ সম্প্রদায় টিঁকে আছে চাকরি, ওকালতি ও ডাক্তারীর উপর। ডাক্তারী-কেরাণীগিরির সঙ্গে জমি-জমার কোনই সম্পর্ক নেই, আছে শুধু ওকালতির সঙ্গে। আমাদের উকিল সম্প্রদায়ের সম্পদ অবশ্য জমিদার ও রায়তের বিরোধের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু Bengal Tenancy জানা এক কথা আর Bengal Tenantry জানা আর এক কথা। এর একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞ হয়ে আর একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। আমার বিশ্বাস বেশিরভাগ সহুরে উকিলরা কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নন্। আর যাঁরা জানেন তাঁরাও কৃষকের ব্যথার ব্যথী হতে পারেন কিন্তু তার কথার কথক নন। বাঙলার উকিলের দল জমিদারের মিত্রপক্ষ। এঁরা যে একমাত্র জমিদারের অন্নে প্রতিপালিত তা অবশ্য নয়। জমিদার ও রায়ত উভয়েই এঁদের মক্কেল; অতএব এঁরা গাছেরও পাড়েন তলার-ও কুড়োন। তবে তিল কুড়িয়ে তাল করার চাইতে গোটা তাল হাতে পাওয়া ঢের বেশি আরামের ও আহ্লাদের কথা। ফলে এঁদের লুব্ধ-দৃষ্টি উপরের দিকেই সহজে আকৃষ্ট হয় এবং আর নামে না। অথচ এই দলের লোকই হচ্ছেন আমাদের পলিটিক্সের ল্যাজামুড়ো দু-ই। পলিটিসিয়ানরা প্রজার হয়ে কোনোরূপ দাবী করতে প্রস্তুত নন, আমার এ বিশ্বাস যদি অমূলক হয় তাহলে তার জন্য প্রধানত পলিটিসিয়ানরাই দায়ী। মডারেট, একষ্ট্রিমিষ্ট কোন দল থেকেই অদ্যাবধি কোনো প্রোগ্রাম বার হয় নি এবং তা বার করবার তাঁদের যে কোনরূপ অভিপ্রায় আছে তার কোনরূপ আভাষও তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

শুনতে পাই যে মডারেট দল জমিদারদের সঙ্গে সন্ধি করবার চেষ্টায় ফিরছেন। তাঁদের নাকি বিশ্বাস যে, নায়েব গোমস্তার সাহায্যে তাঁরা প্রজার ভোট আদায় করতে পারবেন, উপরন্তু জেলার হাকিম ও পুলিশের Co-operation-এর উপরও তাঁরা ভরসা রাখেন। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে তাঁদের প্রোগ্রামের কোন প্রয়োজন নেই। "জোর যার ভোট তার" এই হচ্ছে তাঁদের প্রোগ্রাম।

এ বিষয়ে Extremist দলের মত জানবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সে চেষ্টায় কোনো ফল হয় নি। এ দলের দু-চারজন কর্ত্তাব্যক্তির সঙ্গে আমার এ বিষয়ে যে কথাবার্ত্তা হয়, তা প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। মোটামুটি তাঁদের বক্তব্য এই যে, লাট-দরবারে তাঁরা ঢুকলে বাঙলা দেশকে সেই দেশে পরিণত করবেন যে-দেশে আমাদের মেয়েরা খোকাবাবুর বিয়ে দিতে চায়, অর্থাৎ—যে-দেশে—

"লোকে গাই বলদে চষে।
দাঁতে হীরে ঘষে;
রুই মাছ পালঙের শাক ভারে ভারে আসে"—

এ উদ্দেশ্য যে অতি মহান সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই কিন্তু সন্দেহ আছে তার উপায় নিয়ে। স্বদেশকে "ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা" করে তোলবার উপায় সম্বন্ধে এঁরা নীরব। এ ধরণের কথা আমাদের মুখেই শোভা পায়, কেননা ছেলেভুলোনো ছড়া ভাল করে বাঁধতে আমরাই পারি। কবিত্ব কবিতাতেই করা কর্ত্তব্য, ও-জিনিস গদ্যে খাপ খায় না। আর পলিটিক্সের তুল্য ঝুনো গদ্য এক আইন ছাড়া আর কিছু নেই। সে যাই হোক, এঁদের সঙ্গে কথোপকথনের ফলে আমার মনে এই সন্দেহ জন্মেছে যে, কি উপায়ে কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে, হয় তাঁদের কোনও মত নেই আর না হয়ত সে মত এখন তাঁরা প্রকাশ করতে চান না। তবে এ বিষয়ে কথা তুললে তাঁরা যে রকম অসোয়াস্তি বোধ করেন ও বিরক্তি প্রকাশ করেন তাতে মনে হয় তাঁরা একটু উভয় সঙ্কটে পড়েছেন। প্রজার উপকার করতে

প্রস্তুত কিন্তু প্রজাকে কোনো অধিকার দিতে রাজি নন এমন লোক সকল সমাজেই আছে। এই মনোভাবকেই না বুরোক্রাটিক মনোভাব বলে? তবে এ কথাও ভোলা উচিত নয় যে আমাদের ন্যাশনলিষ্টরা আপাতত বিদেশী বড় পলিটিক্স নিয়ে এতটা ব্যস্ত আছেন যে স্বদেশী ছোট পলিটিক্সে মন দেবার তাঁদের একদম ফুরসৎ নেই। বড় পলিটিক্সের কারবার অবশ্য রাজরাজড়া নিয়ে। মানুষে যখন মুখে রাজা উজির মারতে বসে তখন কি কত ধানে কত চাল হয় তার ভাবনা সে ভাবতে পারে?

(রায়তের প্রোগ্রাম)

দেশের পলিটিসিয়ানরা যখন এ বিষয়ে ঔদাসিন্য দেখাচ্ছেন তখন যা হোক একটা একমেটে প্রোগ্রাম তৈরী করবার চেষ্টা করা যাক। যদি কেউ বলেন :—

"যার কর্ম্ম তার সাজে
অন্য লোকে লাঠি বাজে"—

তার উত্তর, রায়তের ভাবনা ভাবা বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে যে অনধিকার চর্চ্চা নয়, এর ভাল ভাল নজির আছে। বাঙালীর মধ্যে যে-শ্রেণীর লোকদের আমরা গুরু বলে মান্য করি তাঁরা সকলেই প্রজার ব্যথার ব্যথী এবং সে ব্যথা তাঁরা কথায় প্রকাশ করেছেন। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সবাই প্রজার হয়ে ওকালতি করেছেন। এ বিষয়ে কথা কইবার এই হচ্ছে আমার দ্বিতীয় দলীল।

তুমি আমি যখন বালক সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার প্রজার অবস্থা বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন যে রায়তকে যে-অবস্থায় আমরা রেখেছি তার ফল ত্রিবিধ :—

দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব

তারপর তিনি আবার বলেন যে :—

"ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে, ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়"।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা যে কত সত্য তার প্রমাণ আজকের দিনেও বাঙলার রায়তের দল দরিদ্র, মূর্খ ও দাস।

তারা যে মূর্খ সে বিষয়ে ত আর কোনো মতভেদ নেই। তারপর তারা আইনত না হলেও বস্তুত যে দাস, "ক্রীতদাস" না হলেও যে "গর্ভদাস" এ কথা অস্বীকার করা কঠিন। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজও তারা নিজের অধিকারের উপর দাঁড়াতে পারে না, প্রভুর অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অবশ্য ইংরাজের আইন তাদের অনেক অধিকার দিয়েছে, কিন্তু সে শুধু নামে। Tenancy Act আজকের দিনে জমিদারের হাতে সঙ্গীন অস্ত্র। প্রজাকে হয়রান করতে চাও, নাজেহাল করতে চাও, জেরবার করতে চাও ত করো উচ্ছেদের মামলা, সত্ত্বের মোকদ্দমা, জমাবৃদ্ধির নালিশ, ফসলক্রোকের দরখাস্ত, মায় ড্যামেজ বাকী খাজানার নালিশ, আর তার ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দিতে চাও—কর তার নামে বাকীপড়া।

তবে যে প্রজা টিঁকে আছে তার কারণ বেশির ভাগ জমিদার আইনের মার রায়তদের মারেন না, তা ছাড়া মুনসেফ বাবুরা জমিদারের

দাখিলী কাগজ, তা সে জমারই হোক সুমারেরই হোক, পারৎপক্ষে প্রামাণ্য বলে গ্রাহ্য করেন না। আর আমলা-ফয়লার এজাহার যে বিলকুল খেলাপ এই হচ্ছে হাকিমের দৃঢ় ধারণা। এঁরা যে জমিদারের প্রতি সব সময় সুবিচার করেন তা নয়, তবে প্রজা যে বেঁচে বর্ত্তে থাকে সে মুন্সেফবাবু ও Settlement office-এর গুণে। সরকারের বেতনভোগী এই রাজ-কর্ম্মচারীরাই হচ্ছেন বাঙলার রায়তের যথার্থ রক্ষক, জমিদারের বিত্তভোগী-রাজনীতি-ব্যবসায়ী উকিল মোক্তারেরা নন। অতএব একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে প্রজার দাসত্ব আজও ঘোচে নি।

আর তার দারিদ্র্য যে কি ভীষণ তা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার মহোদয়ের কথাতেই প্রকাশ। তিনি সেদিন Bengal Land-holders-দের তরফ থেকে গভর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখেছেন তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"Bengal, if not the whole of India, Bengal probably more so than the rest of India, is an agricultural community—seventy-seven per cent of her population being agriculturists. It is an undeniable fact that seventy per cent of the peasantry out of the seventy-seven per cent of the whole population is so poor, that the income *per capita* is not more than a few rupees a year, and they go to bed every day without a square meal. (Statesman, 5th March 1920).

অন্য বাঙলা :—

বাঙলা, যদ্যপি সমগ্র ভারতবর্ষ না হয়, বাঙলা সম্ভবত বাকী ভারতবর্ষের অধিক, হচ্ছে একটি কৃষিজীবী সম্প্রদায়, কারণ তার অধিবাসীর মধ্যে শতকরা সাতাত্তর জন কৃষক। ইহা অস্বীকার করবার জো নেই যে কৃষকদের মধ্যে শতকরা সত্তর জন, যে কৃষকেরা দেশের লোকের মধ্যে শতকরা সাতাত্তর, এতাদৃশ দরিদ্র যে মাথা পিছু বাৎসরিক আয় দু-চার টাকা মাত্র, এবং তারা পেটভরে না খেয়েই শুতে যায়"—

চক্রবর্ত্তী সাহেবের বক্তব্য আমি যতদূর সম্ভব কথায় কথায় অনুবাদ করেছি, তার উপর সাহিত্যিক হাত চালাই নি এই ভয়ে যে, পাছে কেউ বলে যে আমি তার গায়ে রং চড়িয়েছি। বাঙলা দেশে শতকরা সত্তর জন লোক যে বারো মাস আধপেটা খেয়ে থাকে, স্বজাতির অবস্থা যে এতদূর সাংঘাতিক এ জ্ঞান আমার ছিল না। দিনের পর দিন ও-অবস্থায় যারা শুতে যায় তারা যে আবার বিছানা থেকে ওঠে এইটেই আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে একথা আমরা মেনে নিতে বাধ্য, কেননা যাঁর তাঁর সঙ্গে পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে চক্রবর্ত্তী সাহেবের কখনো ঠিকে ভুল হয় না। বিশেষত তিনি যখন জমিদারের পক্ষ থেকে প্রজার এই ভীষণ দারিদ্র্য কবুল করেছেন তখন রায়তের পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ করা আহম্মকি। আর আজ আমি প্রজার হয়ে ওকালতি করতে বসেছি।

প্রজার দুর্দ্দশা সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখ করতে বঙ্কিমচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন সে হচ্ছে তার স্বাস্থ্যের কথা। সম্ভবত সে যুগে ম্যালেরিয়া দেশকে তেমন আচ্ছন্ন করে ফেলে নি। আজকের দিনে জনসাধারণের শরীরগতিক কি রকম তার পরিচয় সরকারের তরফ

থেকে বর্দ্ধমানের মহারাজাই দিয়েছেন। তাঁর কথা তাঁর ভাষায় এস্থলে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"Roughly speaking we may say that in each of these two years (1918-19) very nearly four per cent of the population has died, and unfortunately the births have not entirely replaced this loss. The more regrettable thing about this appalling mortality is the fact that a large proportion is due to causes that are entirely preventable." (Statesman, March 6, 1920.)

অন্য বাঙলা :—

"মোটামুটি বলতে গেলে, গত দুই বৎসরের প্রতি বৎসর বাঙলা দেশের লোকের মধ্যে শতকরা চার জনের মৃত্যু হয়েছে এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে যত মৃত্যু হয়েছে তত জন্ম হয় নি। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, যে-সব কারণে লোকক্ষয় হচ্ছে তার একটিও অনিবার্য্য নয়।"

এই ত গেল মৃত্যুর তালিকা; কিন্তু যারা বেঁচে থাকে তার মধ্যেও অধিকাংশ লোক জ্বরজীর্ণ। আর বলাবাহুল্য যে এই রোগের অত্যাচার বিশেষ করে সহ্য করতে হয় আমাদের প্রজা সাধারণকে। দারিদ্র্যের সঙ্গে রোগের যোগাযোগটা যে অতি ঘনিষ্ঠ সে কথা উল্লেখ করবার কি আর কোনো দরকার আছে। যারা বারোমাস এক সন্ধ্যে আধপেটা খেয়ে শুতে যায় তারা যে রোগ-শয্যায় শয়ন করলে সেখান থেকে আর ওঠে না, সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে।

অতএব তোমাদের সেই প্রোগ্রাম খাড়া করতে হবে যার বলে বাঙলার রায়ত মূর্খতা, দারিদ্র্য, দাসত্ব ও রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে, বাঙলার না হোক, বেহারের প্রজাবর্গ পলিটিসিয়ানদের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই স্বপক্ষের একটি প্রোগ্রাম খাড়া করেছে। সেই প্রোগ্রাম যদি সঙ্গত হয় তাহলে তা আমাদের শিরোধার্য্য করে নিতে হবে। এখন আমি সেই প্রোগ্রামের বিচার করতে প্রবৃত্ত হলুম।

(প্রোগ্রামের পরিচয়)

কিছুদিন আগে "ইংলিসম্যান" কাগজে হঠাৎ চোখে পড়ল যে বেহারের রায়তেরা মজফরপুরে এক প্রকাণ্ড সভা করে সকলে একমত হয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ক'টি পাশ করেছে।

প্রথম। দেশময় Compulsory Primary Education প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়। প্রতি চারমাইল অন্তর একটি করে Charitable Dispensary থাকা চাই।

তৃতীয়। প্রজার দখলীসত্ত্ববিশিষ্ট জোতমাত্রেই সর্ব্বত্র আইনত হস্তান্তর যোগ্য বলে গণ্য হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ—উক্ত শ্রেণীর জোত জমিদারের বিনা অনুমতিতেই প্রজার হস্তান্তর করবার অধিকার থাকবে।

চতুর্থ। নিজের দখলী জমির গাছ কাটবার অধিকার প্রজার থাকবে, অর্থাৎ—প্রজা সে গাছের সত্ত্বাধিকারী স্বরূপে স্বীকৃত হবে।

পঞ্চম। প্রজা জমিদারের বিনা অনুমতিতে নিজের দখলী জমিতে পুকুর কাটাতে পারবে, কুয়ো খুঁড়তে পারবে, কোঠাবাড়ী তৈরী করতে পারবে।

ষষ্ঠ। প্রজার দখলীসত্ববিশিষ্ট জোতের জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের অতঃপর আর থাকবে না। অর্থাৎ—দখলী-সত্ববিশিষ্ট জোতমাত্রেই আইনত মৌরসী-মোকররী বলে গণ্য হবে।

প্রজা পক্ষের প্রথম দুটি দাবী যে ন্যায্য সে বিষয়ে কোনোরূপ মত-ভেদ নেই। লোকশিক্ষার বিস্তারের জন্য আজ বছর দশেক ধরে সকল দলের পলিটিসিয়ানরা ত সমান চীৎকার করছেন। এবং গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আমাদের কথায় বিশেষ কর্ণপাত করেন না বলে' আমরাও, সরকার কর্ত্তব্যের অবহেলা করেছেন বলে, তাঁর প্রতি নিত্য দোষারোপ করি। তারপর প্রজার রোগের প্রতিকার করাও যে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সে কথা গভর্ণমেণ্টও মানেন। মণ্টেগু-চ্যাম্‌সফোর্ড রিপোর্টে প্রকাশ যে আর পাঁচরকম জিনিসের মধ্যে—the provision of schools and dispensaries within reasonable distance,—these are the things that make all the difference to his life.—

সুতরাং দেখা গেল যে প্রজাপক্ষ ও সরকারপক্ষ এ বিষয়ে একমত। জমিদার পক্ষও এ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ নন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী তাঁর পূর্ব্বোক্ত পত্রে লিখেছেন যে বাঙলার ভবিষ্যৎ গভর্ণমেণ্টকে এই দুই কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে পালন করতে হবে :—

1. Sanitation involving, as it must, ways and

means as to how she is to combat the scourges of malaria and cholera and other similiar scourges.

অস্যার্থ—

"বাঙলাদেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করতে হবে, অর্থাৎ—ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে হবে।"

2. She will be further called upon to provide for the education of her children in the ligt of the recent University Commission Report.

অস্যার্থ—

"নিজের সন্তানদের শিক্ষা দেবার দায় বাঙলার ঘাড়ে পড়বে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিসনের রিপোর্ট অনুযায়ী লোকশিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে।"

বলা বাহুল্য যে, মণ্টেগু-চ্যাম্‌সফোর্ড রিপোর্ট যা দু-কথায় বলেছে, জমিদার পক্ষ তাই একটু ঘুরিয়ে ও ফলিয়ে বলেছেন। এ দু-মতের ভিতর কিন্তু একটু গরমিল আছে। মণ্টেগু-চ্যাম্‌সফোর্ড রিপোর্ট চায় ডিস্‌পেন্‌সারি আর জমিদার পক্ষ চান দেশের আব-হাওয়ার পরিবর্ত্তন। অবশ্য এ দু-ই চাই। তবে সর্ব্বাগ্রে চাই রোগীকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা, সমগ্র দেশকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা পরে হবে। যদি আমরা হাত হাত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করি তাহলে Sanitation-এর দৌলতে দেশকে যে-দিন স্বর্গ করে তুলব সে দিন হয়ত দেখব যে দেশে আর মানুষ নেই, সবারই ইতিমধ্যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়েছে।

মণ্টেগু-চ্যাম্‌সফোর্ড রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে যে, স্কুল ডিস্‌পেন্‌সারি প্রভৃতি প্রজার জীবনকে একদম বদলে দেয়, অর্থাৎ—তার উন্নতি

ঘটায়। শিক্ষা জিনিসটের প্রভাব শুধু জীবনের উপর নয়, মনের উপরও আছে। আজকের দিনে দেশের প্রজাসাধারণের মনের অবস্থা কি?

রাশিয়ার সম্বন্ধে একজন জার্ম্মেন লেখকের বই সে দিন আমি পড়ছিলুম। রাশিয়ার একজন অগ্রগণ্য ব্যারিষ্টার উক্ত জার্ম্মেন ভদ্রলোককে যা বলেছিলেন তার গুটিকয়েক কথা এখানে অনুবাদ করে দিচ্ছি।

—"আমার দেশের লোক অবিচারে অভ্যস্ত। জনসাধারণের উপর অত্যাচার করা আর না করা বড়লোকের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে। আমরা হাজার হাজার বৎসর ধরে এই ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছি, কাজেই আমরা সকল অন্যায় অত্যাহিত অদৃষ্টের নিয়তি বলে মেনে নেই। যে শীলাবৃষ্টি তাদের শস্য নষ্ট করে ও উপরওয়ালার যে অত্যাচারে তারা বঞ্চিত ও পীড়িত হয়, রাশিয়ার কৃষকদের কাছে এ দুয়ের ভিতর কোনই তফাৎ নেই, দু-ই এক জাতীয় ঘটনা। (Hugo Ganz-Le Debacle Russe).

আমি জিজ্ঞেস করি যে আমাদের কৃষকদের মনোভাবের সঙ্গে রাশিয়ান কৃষকদের মনোভাবের কোনো তফাৎ আছে কি? এরা উভয়েই কি একজাত নয়? একেই বলে 'দাস'-মনোভাব। আর আমার মতে মনের দাসত্বই হচ্ছে সব চেয়ে সর্ব্বনেশে দাসত্ব। শিক্ষার একটি প্রধান গুণ এই যে তার প্রসাদে মানুষ মনেও মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়। অজ্ঞতার সঙ্গে মনের দাসত্বের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং গ্রামে গ্রামে স্কুল বসালে আশা করা যেতে পারে যে, আমাদের প্রজাসাধারণের মনের আব-হাওয়া বদলে যাবে। শিক্ষা জিনিসটে আসলে মনের sanitation বই আর কিছুই নয়। মণ্টেগু-চ্যাম্‌সফোর্ড রিপোর্টে রায়তের সম্বন্ধে বলা হয়েছে :—

"His mind has been made up for him by his landlord or banker or his priest or his relatives or the nearest official"—

অর্থাৎ—রায়তের মন, হয় তার জমিদার নয় তার মহাজন, হয় তার পুরুত নয় তার আত্মীয়-স্বজন আর না হয়ত হাতের গোড়ায় যে রাজপুরুষ থাকেন তিনি গড়ে তোলেন।

আশা করা যায় শিক্ষা পেলে রায়তদেরও নিজের মন বলে একটা জিনিস জন্মাবে।

দেখা গেল যে রায়তদের শিক্ষার দাবী ও স্বাস্থ্যের দাবী সকলেই মঞ্জুর করেন, কিন্তু তাদের সত্ত্বের দাবীর কথা কানে ঢোকবামাত্র চমকে ওঠেন এমন লোকের এ দেশে অভাব নেই। শুধু তাই নয়, এঁদের মধ্যে অনেকে আবার প্রজার পক্ষ যারা সমর্থন করতে উদ্যত হন তাঁদের বুদ্ধি ও চরিত্রের উপর নানারূপ দোষারোপ করতে তিলমাত্র দ্বিধা করেন না। যে প্রজার অধিকারের কথা তোলে, কারো মতে সে Bolshevic; কারো মতে সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শত্রু, আবার কারও মতে বা, সে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সম্প্রদায়ের মারা-মারি কাটাকাটির পক্ষপাতী।

এঁরা যদি একটু ভেবে দেখেন তাহলেই দেখতে পাবেন যে, এ সকল অপবাদ কতদূর অমূলক। প্রথমত Bolshevic জন্তুটি যে কি তা তাঁরাও জানেন না, আমরাও জানি নে। জুজুর ভয় ভদ্রলোকের পক্ষে দেখানো অনুচিত, দেখাও ছেলেমি।

দ্বিতীয়ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলে দেবার প্রস্তাব করা আমাদের

পক্ষে মূর্খতা হবে। কেননা উক্ত বন্দোবস্তে প্রজার কোনো ক্ষতি নেই, ক্ষতি হচ্ছে State-এর। সমস্ত বাঙলা কাল সরকারের খাসমহল হলে প্রজার দেয়-খাজানা কমবার কোনই সম্ভাবনা নেই। সুতরাং প্রজার তরফ থেকে সে প্রার্থনা কেউ করবে না।

তৃতীয়ত। নতুন অধিকারের দাবী যে-কেউ করে তার বিরুদ্ধে সকল দেশে চিরকালই ঐ ঘর-ভাঙানোর মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়। এ স্থলে কথাটা একটু ব্যক্তিগত হলেও আমি তা বলতে বাধ্য। বাঙলার জমিদার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোনোরূপ কু-সংস্কার আমার নেই, আর থাকতে পারে না। আমার আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব—সবাই জমিদার, কেউ বড় কেউ ছোট কেউ মাঝারি। আমি জন্মাবধি এই জমিদারের আব-হাওয়াতেই বাস করে আসছি। সুতরাং সে সম্প্রদায় আমার যতটা অন্তরঙ্গ অপর কোনো সম্প্রদায় ততটা নয়। জমিদারের উপর বঙ্কিমচন্দ্র যে আক্রমণ করেছিলেন সে আক্রমণ আমি করতে পারি নে, কেননা আমি জানি যে সে আক্রমণ অন্যায়। ভালমন্দ লোক সকল সম্প্রদায়েই আছে কিন্তু এ কথা জোর করে বলতে পারা যায় যে সাধারণত জমিদারের দল অর্থলোভী নয়। জমিদার আর যাই হোক, মহাজন নয়। আয় বাড়ানোর চাইতে ব্যয় বাড়ানোর দিকেই এ সম্প্রদায়ের ঝোঁক বেশি। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস যে, প্রজার সত্ত্বের দাবী মঞ্জুর করতে জমিদারমাত্রেই নারাজ হবেন না। হয়ত দু-দিন পরে দেখা যাবে যে, জমিদারেরাই প্রজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

রায়তের প্রোগ্রামের বাকী ক'টি দাবী যদি গ্রাহ্য হয় ত আমার বিশ্বাস তার দারিদ্র্যের কিঞ্চিৎ উপশম হতে পারে। অতএব দাবী-গুলির পর পর বিচার করা যাক।

দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট জোত হস্তান্তর যোগ্য, কিম্বা নয় এ প্রশ্নের উত্তরে আইন এখন প্রথার দোহাই দেয়। আইনের কথা হচ্চে যে, যে-জেলায় উক্ত জোত হস্তান্তর করবার প্রথা আছে—সে জেলায় সে জোত জমিদারের বিনা অনুমতিতে রায়ত হস্তান্তর করতে পারে—আর যে জেলায় সেরূপ প্রথা নেই সেস্থলে তার দান বিক্রয় জমিদার ইচ্ছে করলে গ্রাহ্য করতে পারেন, ইচ্ছে করলে অগ্রাহ্য করতেও পারেন।

কিন্তু আসলে ঘটনা কি জানো?—ও-জোত সমগ্র বাঙলায় নিত্য নিয়মিত হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং জমিদারও তা মেনে নিচ্চেন, কেননা তাতে তাঁর লাভ আছে। তবে জমিদার যে প্রথার দোহাই দেন সে শুধু দাখিল-খারিজের মোটা রকম সেলামি আদায় করবার জন্য। কোথায়ও বা জোতের খরিদা মূল্যের চৌথ আদায় করা হয়, কোথাও বা জমার পাঁচ থেকে দশগুণ পণ। এ বিষয়ে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই—যাঁর যে-রকম প্রবৃত্তি ও শক্তি, তিনি এই সুযোগে প্রজাকে সে অনুসারে দুয়ে নেন। যে সম্প্রদায়ের সাতাত্তর জনের মধ্যে সত্তরজন বারোমাসে একদিনও পেটভরে খেতে পায় না, তাদের এরূপ দোহন করা যে অত্যাচার, এ কথা যার শরীরে মানুষের রক্ত আছে সে কখনই অস্বীকার করতে পারবে না। তা ছাড়া, এই দাখিল-খারিজসূত্রে প্রজাকে যে কি পর্য্যন্ত হয়রান-পরিশান করা যায় ও করা হয়, তা জমিদারী সেরেস্তার সঙ্গে যাঁর কোনোরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ

আছে তিনিই জানেন। দাখিল-খারিজের প্রার্থীদের জমিদারের কাছারিতে যাতায়াত করতে করতে পায়ের নড়ি ছিঁড়ে যায়। জোত-খরিদ্দারের পক্ষে জমিদারের সেরেস্তায় নামপত্তন করার চাইতে বিয়ে করা কম কথায় হয়, যদিচ, বিয়ের জন্য লাখ কথা চাই। এ অবস্থায় বেচারার কাছ থেকে নায়েব-গোমস্তা জমানবীশ সুমোর-নবীশ পাইক বরকন্দাজ যে পারে সেই মোচড় দিয়ে দু-পয়সা আদায় করে নেয়। সুতরাং তার এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাবার প্রস্তাব করলে আশাকরি Bolshevism-এর পরিচয় দেওয়া হয় না।

তার পর নিজের জোতের গাছ কাটবার অধিকার। যার নিজের বোনা-শস্য কাটবার অধিকার আছে তার নিজের পোঁতা-গাছ কাটবার অধিকার যে কেন থাকবে না তা আমার বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু এ কথা বলতে গেলেই আইনের তর্ক উঠবে।—উকিল বাবুরা আমাদের Transfer of Property Act পড়ে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির প্রভেদটা শিখে নিতে বলবেন। কিন্তু তার উত্তরে আমি বলব যে বাঙলার রায়তকে যদি মানুষ করতে চাও ত property সম্বন্ধে অনেক শেখা বিদ্যে ভুলতে হবে। বেঁচে থাকবার জন্যে, প্রজার আম কাঁটালের তক্তার প্রয়োজন আছে—শোবার তক্তাপোষের জন্যে, দুয়োরের কপাটের জন্যে, চালের খুটির জন্যে; আর যদি বলো যে তাদের বেঁচে থাকবার কোনো অধিকার নেই তাহলেও তাদের কাঠের দরকার আছে—মলে পোড়াবার জন্যে। যেমন মুসলমান প্রজার সাড়ে তিন হাত জমিতে অধিকার আছে—তার গর্ভে অনন্ত শয্যায় শয়ন করবার জন্যে। সুতরাং গাছ কাটাটা এমন কিছু অপরাধ নয় যার জন্যে তাকে জরিমানা দিতে হবে। তার দারিদ্র্যের কথাটা

স্মরণ করলে এ জরিমানার দায় হতে তাকে মুক্তি দেওয়াটা কি অধর্ম্ম?

তার পর আসে কুয়ো খোঁড়া কোঠাবাড়ী তৈরী করবার অধিকার। এ সম্বন্ধে আইনের কথা হচ্চে একটা বেজায় রহস্য। আইনে বলে যাতে জোতের উন্নতি হয় তা করবার অধিকার প্রজার আছে। এবং জোতের উন্নতি কাকে বলে সে সম্বন্ধে অনেক আইনের তর্ক, দেদার নজির আছে। Bench এবং Bar-এর এই সব চুলচেরা তর্ক, সূক্ষ্ম বিচারের গুণে এ বিষয়ে আইন ক্রমে সরু হতে হতে শেষটা লূতাতন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, এ মামলায় প্রজার শুধু দোকর দণ্ড দিতে হয়, একবার উকিলের কাছে আর একবার জমিদারের কাছে। নিজের পয়সায় প্রজা কোঠাবাড়ী তৈরী করলে তার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের নালিশ চলে। বাস্তু পাকা করতে চেষ্টা করলে প্রজাকে যে ভিটে থেকে উচ্ছন্ন হতে হবে এর চাইতে আর অদ্ভুত ব্যবস্থা কি হতে পারে? তবে ভরসার কথা এইটুকু যে, আদালতে বোনা-আইনের মাকড়সার জালে বাঁধা পড়ে কীট, মানুষ নয়। আর আমরা চাই বাঙলার প্রজা আর কীট হয়ে থাকবে না, সব মানুষ হয়ে উঠবে।

প্রজার শেষ দাবী এই যে তার জোত মৌরসি ও মোকররি হবে। অর্থাৎ—অতঃপর জমাবৃদ্ধির অধিকার জমিদারের আর থাকবে না। আমার মতে Record of Rights প্রজার জমি অনুসারে যে জমা ধার্য্য করে দেয় সেই জমাই আইনত চিরস্থায়ী হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ—যতদিন State-এর সঙ্গে জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে, ততদিন জমিদারের সঙ্গেও রায়তের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে। এ দাবী অপূর্ব্বও নয় অদ্ভুতও নয়। ১৮৩৯

খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় বিলাতে পার্লেমেণ্টারি কমিশনের সম্মুখে যখন সাক্ষ্য দেন, তখন তিনি প্রজার হিতকল্পে এই দাবী উপস্থিত করেছিলেন। বাঙলা দেশের এই অদ্বিতীয় মহাপুরুষের বাক্য আমার শিরোধার্য্য। তাঁর সেই সাক্ষ্যের রিপোর্ট পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে যে পলিটিক্স সম্বন্ধেও তাঁর দিব্যদৃষ্টি ছিল। তারপর আমার মতের স্বপক্ষে আবার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা উদ্ধৃত করতে বাধ্য হলুম। তিনি গভর্ণমেণ্টকে লিখেছেন যে :—

"It would be iniquitous to think of taxing a population so poor as this, and my Committee venture to enter an emphatic protest against any idea of further taxation"—

অস্য বাঙলা :—

"এরূপ দরিদ্র সম্প্রদায়ের উপর টেক্স বসানোর চিন্তাও পাপ কার্য্য হবে এবং আমার কমিটি এস্থলে আবার নূতন কোনো টেক্স বসানোর বিরুদ্ধে তাদের ঘোর আপত্তি জোরগলায় জানিয়ে রাখতে সাহসী হচ্ছে"—

উপরোক্ত কথা কটির মধ্যে "টেক্স" কথাটি বদলে তার জায়গায় "খাজনা" বসিয়ে দিলে, আমার বক্তব্যের একটা জোরালো সংস্করণ পাবে। টেক্স অবশ্য State আদায় করে আর খাজানা জমিদার, অর্থাৎ—প্রথম ক্ষেত্রে সমগ্রজাতি আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ। সুতরাং যে-টাকা জাতীয় কার্য্যে ব্যয় করবার জন্য জাতির পক্ষে আদায় করা পাপ কার্য্য, সেই টাকা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিজের ব্যয়ের জন্য আদায় করা যে কি হিসেবে পুণ্যকার্য্য, তা বোঝবার মত সূক্ষ্ম ধর্ম্ম-জ্ঞান আমার নেই।

আমি জানি এর উত্তরে পলিটিসিয়ানরা কি বলবেন। তাঁরা বলবেন যে, বর্ত্তমান State ত আমাদের জাতীয় নয়, ও-হচ্ছে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট, অতএব এ ক্ষেত্রে State-এর স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ এক নয়। তাথাস্তু। কিন্তু নূতন টেক্সের বিরুদ্ধে চক্রবর্ত্তীসাহেবপ্রমুখ জমিদার বর্গের জোর প্রতিবাদের কারণ দর্শানো হয়েছে রায়তের দারিদ্র্য। রায়ত যদি নতুন টেক্সের চাপ আর বিন্দুমাত্রও সইতে না পারে তাহলে জমাবৃদ্ধির চাপই যে সে কি করে সইতে পারবে, তা আমি বুঝতে পারি নে। তবে আমি বুঝতে পারি নে বলে যে পলিটিসিয়ানরা বুঝতে পারেন না, তা অবশ্য হতেই পারে না। সুতরাং জমিদার কর্ত্তৃক হত-দরিদ্র প্রজার উপর জমাবৃদ্ধির চাপ দেবার কি সব পেট্রিয়টিক এবং ন্যাশনলিষ্ট ওরফে "স্বদেশী" ও "স্বরাজী" যুক্তি আছে তা শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে রইলুম।

আপাতত দেখতে পাচ্ছি যে, যেখানে নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে সেখানে প্রজার স্বার্থের কথা শুনলে আমাদের পলিটিসিয়ানদের 'পেট্রিয়টিক'-জ্বর ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়। দেশের যাঁরা ভাল চান তাঁদের পক্ষে রায়তদের উপরোক্ত দাবী ক'টি প্রসন্ন মনে গ্রাহ্য করে নেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমত, এ-ক'টি অধিকারে তারা অধিকারী হলে তাদের দারিদ্র্যের কিঞ্চিৎ লাঘব হবে। দ্বিতীয়ত, তারা তাদের দাসত্ব হতে মুক্তিলাভ করবে। একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার বলে তাদের 'দাস' বুদ্ধি দূর করা যাবে না, সেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চাই তাদের অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটানো।

পূর্ব্বে যে রাশিয়ান ব্যারিষ্টারের উক্তি উদ্ধৃত করে দিয়েছি

তিনিই তাঁর জর্ম্মান অতিথিকে আর যে একটি কথা বলেছিলেন সেটি এখানে তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। সে কথা এই :—

"আমাদের জনসাধারণের মধ্যে সব চাইতে কিসের বিশেষ অভাব আছে জানেন?—স্বাধিকারের জ্ঞান। মনস্তত্ত্ববিদেরা জানেন যে সত্ত্বের জ্ঞান থেকেই মানুষের অধিকারের জ্ঞান জন্মায়। আপনি বোধ হয় জানেন না যে, এদেশের কৃষকদের মধ্যে অতি অল্প-সংখ্যক লোকের জমি তার নিজস্ব সম্পত্তি।"

বাঙলার প্রজা যদি জমি হস্তান্তর করবার, গাছ কাটবার, কোঠা-বাড়ী করবার, কুয়ো খোড়বার অধিকার পায় এবং সেই সঙ্গে তার জোত মৌরসী-মকররি হয়, তাহলে সে ইংরাজিতে যাকে বলে peasant proprietor, তাই হয়ে উঠবে। প্রজা জমির মালিক হয়ে উঠলে, জাতির শক্তি ও দেশের ঐশ্বর্য্য যে কতদূর বেড়ে যায় তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ—বর্ত্তমান ফ্রান্স। আর প্রজাকে সত্বহীন ও দরিদ্র করে রাখলে তার ফল যে-কি হয় তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ বর্ত্তমান রাশিয়া। যাঁরা Bolshevism-এর ভয়ে কাতর তাঁদের অনুরোধ করি যে, তাঁরা বাঙলার রায়তকে বাঙলার peasant proprietor করবার জন্য তৎপর হোন। যে-রকম দিনকাল পড়েছে তাতে করে মানুষকে আর দাস ও দরিদ্র করে রাখা চলবে না। প্রজাকে এ সব অধিকার আমরা যদি আজ দিতে প্রস্তুত না হই ত কাল তারা তা কেড়ে নিতে প্রস্তুত হবে। পৃথিবীর লোকের এখন মাথার ঠিক নেই, তার উপর তাদের ঐহিক উন্নতির পিপাসা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে।

(চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত)

প্রজার এক নম্বর ও দু'নম্বর দাবী আমরা যে মুখে অত সহজে মেনে নিই তার কারণ, কাজে তা পূরণ করা অতিশয় কঠিন। দেশ-যোড়া রোগ ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যে টাকার দরকার সরকারের তহবিলে তার সিকির সিকিও নেই। এবং এই অতিরিক্ত টাকা যে কোথা থেকে আসবে তার সন্ধান আমরা আজও পাই নি। আয় বৃদ্ধি না করে অবশ্য ব্যয়বৃদ্ধি করা চলে না আর সরকারী তহবিলের আমদানির মুখ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চিরদিনের মত বন্ধ করে রেখেছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মামলাটা এখন মুলতবি থাকবে। কত দিনের জন্য বলা কঠিন, কেননা আজকের দিনে ও-মামলার তারিখ ফেলতে কেউ প্রস্তুত হবেন না। ইতিমধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিধানের যে সব অকিঞ্চিৎকর বন্দোবস্ত করা হবে তাতে করে দেশের লোকের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কোনই সুসার হবে না—মধ্যে থেকে কতকগুলো টাকা শুধু জলে ফেলা হবে।

অপর পক্ষে প্রজার অপর দাবীগুলি আমাদের পার্লামেণ্ট বসবা-মাত্র আমরা একদিনে পুরণ করে দিতে পারি। Tenancy Act-এর গুটিকয়েক ধারা বদলালেই কার্য্য উদ্ধার হয়ে যায়। এতে কোনো খরচা নেই।

তবে বর্ত্তমান Tenancy Act-এর উপর হস্তক্ষেপ করবার প্রস্তাব করলেই অমনি চারিদিক থেকে চীৎকার উঠবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এমন কথাও শুনতে পাব

যে, ও-কার্য্য করাও যা আর ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করাও তাই। জানই ত আজকাল ধর্ম্ম শব্দের মানে বদলে গেছে। আগে ধর্ম্ম বলতে লোকে বুঝত সেই বস্তু, যার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক আছে, যার উপরে লোকের পারলৌকিক ভয়-ভরসা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজকাল ধর্ম্মের মানে হয়েছে temporal, অর্থাৎ—সাংসারিক ব্যাপার। এতে আশ্চর্য্য হবার কোনো কারণ নেই, কেননা যে-কালে পলিটিক্স হয়ে উঠেছে ধর্ম্ম, সে কালে ধর্ম্ম অবশ্য পলিটিক্স হতে বাধ্য। অতএব এখানে বলা দরকার যে প্রজার দাবী অনুযায়ী Tenancy Act-এর বদল করলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। কি করা হবে জানো?—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকার প্রজাকে যে কথা দিয়েছিলেন এবং যে কথা আজ পর্য্যন্ত খেলাপই করা হয়েছে, শুধু সেই কথা রাখা হবে, এর বেশি কিছুই নয়।

আমার এ কথা যে সত্য, তা যিনিই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্ম-বৃত্তান্ত জানেন তিনিই স্বীকার করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে ইতিবৃত্ত খুব কম লোকেরই জানা আছে। আমাদের জাতীয় স্মরণশক্তি এতই কম যে, যে-জিনিস ইংরাজের আমলে জন্মগ্রহণ করেছে তাকে আমরা মান্ধাতার আমলে রবলে মেনে নিই। অতএব এস্থলে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাসটা বর্ণনা করা আবশ্যক মনে করি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলা দেশে ঘোর অরাজকতা ঘটেছিল। সেই অরাজকতার ফলে ইংরেজ এদেশের রাজা হয়ে বসলেন এবং সেই অরাজকতার হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে ইংরাজরাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি করলেন। এ আইন হচ্ছে

আসলে একটি emergency legislation, যেমন গতকল্যের Ghee Act এবং আগামী কল্যের Rent Act; এ রকম আইন অবশ্য মেয়াদীই (temporary) হয়ে থাকে; কিন্তু জমিদারের কপালজোরে এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয়ে গেল। এরূপ হবার কারণ কতকটা দেশের অবস্থার গুণ আর কতকটা ইংরাজের বুদ্ধির দোষ।

দেশ যে কতদূর অরাজক হয়ে উঠেছিল তার সাক্ষী স্বয়ং ভারতচন্দ্র। মোগলে-মারহাট্টায় মিলে বাঙলার অবস্থা যে কি করে তুলেছিল তার বর্ণনা অন্নদামঙ্গলের গ্রন্থসূচনাতেই পাবে। সে বর্ণনার কতক অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:—

"সুজা খাঁ নবাবসুত সরফ্‌রাজ খাঁ।
দেয়ান আমলচন্দ্র রায় রায়রাঁয়া॥
ছিল আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলিবর্দ্দি হইলা নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিল পাতসা খেতাব॥

* * * * *

কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥

* * * * *

ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুটিয়া পুড়িয়া॥

এই ত গেল মোগলের ব্যবহার। তারপর শোন মারহাট্টার কীর্ত্তি :—

* * * * *

স্বপ্ন দেখি বর্গি রাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইলা রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত ॥

* * * * *

বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি ॥
লুটি বাঙ্গালার লোক করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গাপার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল ॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম পুড়ি পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ি বহুড়ি ॥
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল ॥”

* * * * *

নবাব বর্গির ভয়ে পালিয়ে রইলেন বটে কিন্তু বাঙালীর উপর অত্যাচার তাঁর বাড়ল বই কমল না। আবার ভারতচন্দ্রের কথা শোনো :—

* * * * *

“নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায় ॥

নদীয়া প্রভৃতি চার সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শান্তমতি ॥
মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে’ বারো লক্ষ টাকা চায় ॥

* * * * *

লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার-লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ ॥
বর্গিতে লুটিল কত কত বা সুজন।
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন ॥”

* * * * *

উপরোক্ত বর্ণনা কাব্য নয়—খাঁটি ইতিহাস। আলিবর্দ্দি খাঁ যে প্রজাপীড়ন করে’ টাকা আদায় করেছিলেন, সে বর্গির রাজাকে চৌৎ দেবার জন্য। একদিকে দিল্লীর বাদশাকে, আর একদিকে বর্গির রাজাকে কর দিতে না পারলে তার নবাবী থাকে না, কাজেই বাঙলার প্রজাকে সর্ব্বস্বান্ত করতে তিনি বাধ্য হলেন। এখানে একটি কথার মানে বলে দিই। সাজোয়াল শব্দের অর্থ সেই সরকারী কর্ম্মচারী যে সরকারের তরফ থেকে খাসে প্রজার কাছ থেকে খাজানা আদায় করে। এই সুজন সাজোয়ালটি যে কে তা জানি নে, কিন্তু সেকালে অমন সুজন দেদার মিলিত। এবং এই সব সুজনের হাত থেকে প্রজাকে রক্ষা করা জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার অন্যতম কারণ।

ভারতচন্দ্রের কবিতার এতটা অংশ উদ্ধৃত করে দিতে এই কারণে বাধ্য হলুম যে "অন্নদামঙ্গল" আজকাল কেউ পড়ে না, সকলে পড়ে "মেঘনাদবধ"। বাঙলার চেয়ে লঙ্কা আমাদের মনকে বেশি পেয়ে বসেছে।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হয়। তখন বাঙলার তক্তে বসলেন সিরাজউদ্দৌলা। এঁর শাসন যে দেশের লোকের কাছে কতদূর প্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ বছর না পেরুতেই বাঙলায় ঘটল রাষ্ট্রবিপ্লব। যে ঘটনায় সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের গদি ও পৈতৃক প্রাণ, দু-ই হারালেন, একে আমি রাষ্ট্রবিপ্লব বলছি, কেননা জন কোম্পানীর সেকালের কর্ত্তাব্যক্তিরা সকলেই এ ব্যাপারকে Revolution বলেই উল্লেখ করেছেন। পলাসীর যুদ্ধ জেতবার ফলে কোম্পানী বাহাদুর বাঙলার রাজগদি পান নি, পেয়েছিলেন শুধু চব্বিশ পরগণার জমিদারীসত্ব।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ পর্য্যন্ত মিরজাফরের আমল। এ তিন বৎসর গোলেমালে কেটে গেল। ফলে বাঙলার অরাজকতা বাড়ল বই কমল না।

তারপর নবাব হলেন মিরকাশিম। তাঁর নবাবীর মেয়াদ ছিল পাঁচ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ধরে তিনি বাঙলার প্রজার রক্ত শোষণ করলেন। কি উপায়ে তা বলছি।—রাজা টোডর মলের সময় বাঙলার প্রজার আসল জমা স্থির হয়। এ জমাকে Land Tax বলা যেতে পারে। এ জমাবৃদ্ধি কোনো নবাব করেন নি। আসল জমা স্থির রেখে নবাবের পর নবাব শুধু আবয়াবের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়ে চললেন। এই আবয়াবকে Cess বলা যেতে পারে।

মিরকাশিমের হাতে এই আবয়াব কি রকম বিপুলায়তন হয়ে উঠেছিল তার সাক্ষাৎ পাবে Fifth Report-য়ে। মিরকাশিমের আমলের একখানি দাখিলা দেখলে তোমার চক্ষুস্থির হয়ে যাবে।

তারপর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশা কোম্পানী বাহাদুরকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করলেন। অর্থাৎ—সরফরাজ খাঁর আমলে আমলচন্দ্র রায় রায়-রাঁয়ার যে পদ ছিল, ১৭৬৫ সালে কোম্পানী বাহাদুর সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তফাতের মধ্যে এই যে আমলচন্দ্র প্রভৃতি বাঙলার নবাবের কর্ত্তৃক নিযুক্ত হতেন আর কোম্পানী বাহাদুর দেওয়ান হলেন দিল্লীর বাদশার সনন্দের বলে। ফলে কোম্পানী পেলেন বাঙলার অর্দ্ধেক রাজস্ব আর বাকী অর্দ্ধেক রইল নবাব নাজিমের হাতে। এ কালের ভাষায় বলতে হলে—দিল্লীর বাদশা Diarchy-র সৃষ্টি করলেন।

এ ক্ষেত্রে ফৌজদারী সংক্রান্ত সকল রাজকার্য্য নবাব নাজিমের হাতে reserved subject-স্বরূপ রয়ে গেল। আর কোম্পানীর হাতে যে কি কি বিষয় transferred হয়ে এল, তার সন্ধান নেওয়া দরকার, কেননা এই transfer-সূত্রেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জন্মলাভ করলে। বলা বাহুল্য নবাবের আমলে সবই ছিল অচিরস্থায়ী।

দিল্লীর বাদশার ফারমানের বলে কোম্পানী বাঙলার প্রজার কর আদায় করবার অধিকার পেলেন, কিন্তু এই কর আদায়ের ভার কোম্পানী নিজ হাতে নিলেন না—নবাবের নিয়োজিত নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর হাতেই রেখে দিলেন।

তারপর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে মহা দুর্ভিক্ষে (বাঙলায় যাকে আমরা বলি ছেয়াত্তরের মন্বন্তর) যখন বাঙলার এক তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে

প্রাণত্যাগ করলে, এবং দেশ যখন একটা মহা শ্মশানে পরিণত হল তখন কোম্পানীর বিলেতের ডিরেক্টরদের মাথার টনক নড়ল। তাঁরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে Hastings সাহেবকে বাঙলার গভর্ণর পদে নিযুক্ত করে এ দেশে পাঠিয়ে দিলেন—প্রধানত খাজানা আদায়ের একটা সুব্যবস্থা করবার জন্য। প্রচলিত ব্যবস্থা যে সুব্যবস্থা ছিল না, তার প্রমাণ এই দুর্ভিক্ষের বৎসর যত টাকা কর আদায় হয় তার পূর্ব্বে কোনো বৎসর তত টাকা হয় নি।

এই দুর্ভিক্ষে দেশের যে কি সর্ব্বনাশ ঘটেছিল, তার পরিচয় Hunter's Annals of Rural Bengal-য়ে পাবে। এর ভোগ বাঙালী জাতিকে আরও ত্রিশ বৎসর ভুগতে হয়েছিল। এ মন্বন্তরের ধাক্কা বাঙলা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও আর সামলে উঠতে পারে নি। এই কথাটা মনে রাখলে বুঝতে পারবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কেন আমি Emergency legislation বলেছি।

Hastings সাহেব কলকাতায় এসে—বাঙলার জমির পাঁচশালা বন্দোবস্ত করলেন। এ বন্দোবস্ত করা হল কিন্তু ডাকসুরত ইজারাদারের সঙ্গে। জমিদার অ-জমিদার নির্ব্বিচারে সর্ব্বোচ্চ ডাককারীকেই জমির ইজারা দেওয়া হল। বলা বাহুল্য ইজারাদার বাঙলার প্রজাকে লুটে নিলে। এই সূত্রে Hastings সাহেবের সঙ্গে তাঁর কাউন্সিলের ঝগড়া বাধল। কেননা ধরা পড়ে গেল যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ইজারাদারেরা স্বয়ং Hastings সাহেব এবং অন্যান্য ইংরাজ কর্ম্মচারীদের বেনামদার বই আর কেউ নয়। এই সুযোগে Hastings সাহেবের পরম শত্রু Francis সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং কোম্পানীর বিলেতি

ডিরেক্টারদের সে প্রস্তাবে সম্মত করেন। কিন্তু ডিরেক্টার-মহোদয়দের এ বিষয়ে যা হোক একটি মনস্থির করতে আরো দশ বৎসর কেটে গেল। অতঃপর অনেক বলাকওয়া অনেক লেখালেখির পর তাঁদের আদেশ উপদেশ মতই, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত করা হল। এই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্তন। অর্থাৎ—যে বৎসর ফ্রান্সের প্রজার peasant proprietorship-এর সূত্রপাত হল সেই বৎসরই বাঙলার প্রজা সকল সত্ত্ব হারাতে বসল।

এ ক্ষেত্রে চারিটি সমস্যা ওঠেঃ—

(১) বন্দোবস্ত কার সঙ্গে করা হবে— প্রজার সঙ্গে, না জমিদারের সঙ্গে?

(২) জমিদার বলতে কি বোঝায়—ভূম্যধিকারী, না সরকারের টেক্স কালেক্টর?

(৩) যদি জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয় তাহলে সে বন্দোবস্ত মেয়াদি না মৌরসী করা হবে?

(৪) জমিদারকে যদি মৌরসী পাট্টা দেওয়া হয় তাহলে তার দেয়ো মাল খাজানা চিরদিনের মত নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হবে কি না?

এই সমস্যার মীমাংসা করা হ'ল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এবং তার কারণ এই যে কোম্পানীর কর্ত্তাব্যক্তিদের মতে তা করা ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না, কেননা কোম্পানীর গভর্ণমেণ্ট হচ্ছে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট।

কি সব তদন্তের পর, কি যুক্তি অনুসারে জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা স্থির হল তার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ Fifth Report-য়ে দেখতে পাবে। এস্থলে আমি সকল যুক্তিতর্ক বাদ দিয়ে

Sir John Shore প্রমুখ কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারীরা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তারি উল্লেখ করছি।

প্রথম। রায়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা অসম্ভব। এদেশে জমি-জমার হিসেব এত জটিল যে, ইংরাজ কর্ম্মচারীদের পক্ষে তা আয়ত্ত করা অসম্ভব। বিশেষত তাঁরা যখন বাঙলা ভাষা জানেন না। এ ক্ষেত্রে হস্তবুদ তৈরী করবার খাজানা আদায় করবার, বাকী-বকেয়ার হিসাব কিতাব রাখবার ভার দেশী আমলাদেরই হাতে থাকবে। তারা যা খুসি তাই করবে, তহবিল তছরূপ করবে, রাজা প্রজা দু দলকেই ফাঁকি দেবে। এবং ইংরাজ কালেক্টররা তার কোনো প্রতিকার করতে পারবেন না। কারণ এই দেশী তহশিলদারদের কাছ থেকে হিসেব নিকেশ বুঝে নেবার মত শিক্ষা ও জ্ঞান ইংরাজ কালেক্টরের নেই। অতএব খাজানা যদি নিয়ম মত ও নিয়মিত আদায় করতে হয় তাহলে জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়।

দ্বিতীয়। জমিদার ভূম্যধিকারী কিম্বা টেক্স কালেক্টর তা বলা অসম্ভব; কেননা Ownership বলতে ইংরাজ যা বোঝে এ দেশের লোকে তা বোঝে না। আমরা সবাই জানি Austin-এর ভাষায় সত্বের অর্থ হচ্ছে :—

"A right over a determinate thing indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition, and unlimited in point of duration"—

জমির উপর যে তাদের উক্তরূপ সত্ব আছে এ কথা সে কালে কোনো জমিদারও দাবী করেন নি। কেননা তাঁরা জানতেন যে,

রায়তকে তাঁরা উচ্ছেদ করতে পারতেন না, রায়তি জমি খাস করতে পারতেন না, এবং বাঙলার নবাব ও দিল্লীর বাদশা এঁদের ভিতর যাঁর খুসি তিনিই যখন তখন জমিদারী জমিদারের গালে চড় মেরে কেড়ে নিতে পারতেন। যেমন জাফর খাঁ ওরফে মুরশিদ কুলি খাঁ কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙলার প্রাচীন ভূম্যধিকারীদের নির্ব্বংশ করে নতুন জমিদারের দল সৃষ্টি করেছিলেন।

এ অবস্থায় কোম্পানীর কর্ত্তাব্যক্তিরা স্থির করলেন যে জমিদারেরা যদি ভূম্যধিকারী নাও হয় ত, আইনত তাঁদের তা হতে হবে। তাঁদের ধারণা ছিল যে, সভ্যদেশে জমিদারের সঙ্গে প্রজার সেই সম্বন্ধ থাকা উচিত, সে যুগে English landlord-দের সঙ্গে Irish tenant-দের যে সম্বন্ধ ছিল। এস্থলে Sir John Shore-এর মত উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"The most cursory observation shows the situation of things in this country to be *singularly confused.* The relation of a zemindar to government, and of a ryot to a zemindar is neither that of a proprietor nor of a vassal; but a compound of both. The former performs acts of authority, unconnected with proprietory right—the latter has rights without real property. Much time will, I fear, elapse before we can establish a system, perfectly consistent in all its parts, and before we can reduce the compound relation of a zemindar to government, and of a ryot to a zamin-

dar to the simple principles of landlord and tenant". (Fifth Report, Vol. II, p. 520).

এই উদ্ধৃত বাক্য ক'টির বাঙলায় অনুবাদ করবার সাধ্য আমার নেই, কেননা কি বাঙলা কি সংস্কৃত এ দুই ভাষাতে এমন কোনো শব্দ নেই যা ইংরাজি real property-র প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের ভাষায় ও-শব্দ নেই, কেননা আমাদের দেশে ও-বস্তু কস্মিন কালেও ছিল না।

Shore সাহেবের কথাই প্রমাণ যে এদেশের জমিদারের সঙ্গে এদেশের রায়তের সম্বন্ধ তাঁর কাছে বড়ই গোলমেলে লেগেছিল। কাজেই যা গোল তাকে তিনি চৌকোশ করবার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি অবশ্য এ পরিবর্তন রয়ে-বসে করতে চেয়েছিলেন। Lord Cornwallis-এর কিন্তু আর তর সইল না। তিনি আইনের ঠুক-ঠাকের বদলে একঘায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসলেন। ফলে বাঙলার প্রজা বাঙলার জমির উপর তার চিরকেলে সত্ব-স্বামীত্ব সব হারালে, আর রাতারাতি বাঙলার জমির নির্ব্যূঢ় সত্বাধিকারী জমিদার নামক এক শ্রেণীর লোক জন্মলাভ করলে।

Lord Cornwallis যদি অত তাড়াহুড়ো করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করে বসতেন তাহলে রায়তের peasant proprietorship নষ্ট হত না। কারণ রাজা প্রজার যে সম্বন্ধ সে কালের ইংরাজদের বুদ্ধির অগম্য ছিল; কালক্রমে তার মর্ম্ম তাঁরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। আজ প্রায় দেড়শ বৎসর ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অভ্যস্ত হয়ে আমাদেরও মনে এই ধারণা জন্মেছে যে

রায়তের আর যাই থাক জমির উপর কোনোরূপ মালিকীসত্ব নেই এবং পূর্ব্বেও ছিল না লোকের এই ভুল ভাঙানো দরকার। তাই এস্থলে ভারতবর্ষের জমিজমার বিষয় একজন বিশেষজ্ঞ ইংরাজের কথা নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"It is well-known that in the only place where the "Laws of Manu" allude to a right in land, the title is an individual one, and is attributed to the natural source—still so universally acknowledged throughout India—that a man was the first to remove the stumps and prepare the land for the plough. At the same time we see, from very early times, how the grain produce of every allotment is not all taken by the owner of the land, but part of it is taken by the owner of the land, and part of it is by custom assigned to this or that recipient. It is not, observe, that the land allotment itself is not completely separated, but when the crop is reaped, the owner (as we may call him) at once recognised that out of his grain heap at the threshing floor, not only the great Chief or Raja, and his immediate headman, but a variety of other villagers, have customary rights to certain shares—if it is only sometimes a few double-handfuls or other small measure. All this seems to spring

from the sense of co-operation (however indirect) in the work of settlement that made the holding possible. It seems to me quite clear that a sense of individual "property" may arise coincidently with a sense of a certain right in others to have a share of the produce (on the ground of co-operation) and the two are not felt to conflict.

(Baden Powell—Village Community. p. 130-31).

কষ্ট করে এর বাঙলা করবার কোনই প্রয়োজন নেই। কেননা বিলেতি আইন চর্চ্চা করে যাঁদের মন ও মত Sir John Shore-এর অনুরূপ হয়ে উঠেছে তাঁদের দৃষ্টির জন্যই Baden Powell সাহেবের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা গেল। যে চষে, জমি তার। এবং সে জমির উৎপন্ন ফসলে প্রথম রাজা, তারপর আর পাঁচ জনের, যথা—গ্রামের মণ্ডল ধোপা নাপিত কুমোর কামার প্রভৃতিরও ভাগ বসাবার অধিকার আছে। এই হচ্ছে Badan Powell সাহেবের মোদ্দা কথা। আর এই ছিল ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর কারণ রাজনৈতিক। ইংরাজ-রাজ যখন বিদেশীরাজ তখন দেশে এমন একটি দলের সৃষ্টি করা আবশ্যক, যাদের স্বার্থ ইংরাজরাজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। যেহেতু আপদে বিপদে এই দল ইংরাজরাজের পক্ষ অবলম্বন করবে।

তৃতীয়। জমিদারকে যখন জমির মালিক সাব্যস্ত করা হল, বলা বাহুল্য তখন সে মালিকী সত্ব চিরস্থায়ী বলে স্বীকৃত হল। যে

সত্ব unlimited in point of duration নয়, সে সত্ব ইংরাজের মতে আইনত মালিকীসত্ব হতেই পারে না।

চতুর্থ। তারপর জমিদারের দেয় রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের মত ধার্য্য করে দেবার প্রস্তাব Francis সাহেব প্রথমে উত্থাপন করেন। তাঁর কথা এই যে, কোম্পানী বাহাদুর বাঙলা থেকে যে রাজস্ব আদায় করবার অধিকারী, তা not a tribute imposed on a conquered people but its land revenue"।

মনে রেখো যে এ সময়ে জন কোম্পানী রাজা হিসেবে নয়, দিল্লীর বাদশার দেওয়ান হিসেবেই ভূমিকর আদায় করবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ অবস্থায় আদায়ী সেরেস্তার ব্যয় সংকুলান করবার জন্য যে পরিমাণ টাকা আদায় করা আবশ্যক তার অতিরিক্ত টাকা আদায় করা Francis সাহেবের মতে যুগপৎ অন্যায় ও অসঙ্গত। তাঁর নিজের কথা এই :—"The whole demand upon the country, to commence from April 1777, should be founded on an estimate of the permanent services, which the government must indispensably provide for ; with an allowance of a reasonable reserve for contingencies......I know not for what just or useful purpose any government can demand more from its subjects ; for unless expenses are collected for the express purpose of absorbing the surplus, it must be dead in the treasury, or be embezzled. Having ascertained the amount the Government needed to

raise by land revenue, the contribution of the districts should be settled accordingly and "fixed for ever".

(Fifth Report, Vol. I, p. ccc").

সংক্ষেপে Francis সাহেবের মতে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যত্র ব্যয় তত্র আয় হওয়া প্রয়োজন। অতএব দেশের শাসনসংরক্ষণ করবার জন্য, সম্ভাবিত ব্যয় আয়ের একটা বজেট তৈরী করে আবহমান-কালের জন্য সেই বজেটই কায়েম রাখা দরকার। এই মতানুসারে বাঙলার রাজস্বও চিরস্থায়ী করা হল। উপরোক্ত সব কারণে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হল। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা ঠিক যে এ দেশের জলবায়ুর গুণে সব জিনিষই চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে।

(চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রজাসত্ত্ব)

এখন দেখা যাক এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির উপর প্রজার সত্ব চিরস্থায়ী হ'ল কিম্বা একদম কেঁচেগল।

প্রজার যে ভিঁটে ও মাটী দুয়ের-ই উপর কিছু কিছু সত্ব ছিল সে-সত্য Sir John Shore প্রভৃতি সকলেই আবিষ্কার করেছিলেন। এবং সেই আবিষ্কারের ফলেই না তাঁদের মনে অতটা ধোঁকা লেগেছিল! একই জমির উপর জমিদার ও রায়ত—উভয়েরি যে একযোগে সত্ব-স্বামীত্ব কি করে থাকতে পারে এ ব্যাপার তাঁদের ধারণার বহির্ভূত ছিল। কেননা, কি Roman Law, কি বিলাতের Common Law—ও-দুয়ের কোনোটির সঙ্গেই এ ব্যাপার মেলে না।

ফলে যে-সম্বন্ধ ছিল মিশ্র তাকে তাঁরা শুদ্ধ করতে চাইলেন। ভারত-বর্ষের মাটীর এমনি গুণ যে সে মাটী যে মাড়ায় সে-ই শুদ্ধিবাতিকগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

প্রজা এখনো যেমন, তখনো তেমনি, প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল,—খোদকস্ত আর পাইকস্ত। যে প্রজার বাস্তু ও ক্ষেত দু-ই এক গ্রামস্থ, তার নাম খোদকস্ত প্রজা। আর ভিন্ন গ্রামের লোক যে-ক্ষেত্রে ঠিকে বন্দোবস্তে সুরতজমি চাষ করে তার নাম পাইকস্ত। বলা বাহুল্য যে, প্রজাসত্ব শুধু খোদকস্ত প্রজারই ছিল, কেননা পাইকস্ত প্রজার উপর জমিদারের যেমন কোনোরূপ স্বামীত্ব ছিল না, জমির উপর তারও তেমনি কোনোরূপ সত্ব ছিল না।

সে কালের প্রজাসত্বের মোটামুটি ফর্দ্দ নেই।—

(১) প্রজাকে উচ্ছেদ করবার অধিকার জমিদারের ছিল না, অর্থাৎ—তার জোত ছিল দখলীসত্ববিশিষ্ট।

(২) সে জোত পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করবার অধিকার খোদকস্ত রায়তমাত্রেরই ছিল। আর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করবার সত্ব যে মালিকীসত্ব, এ বিষয়ে Privy Council-এর নজির আছে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জোত হস্তান্তর করবার অধিকার প্রজামাত্রেরই ছিল। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, সেকালে জমি হস্তান্তর করবার সুযোগ ও প্রয়োজন—এ দুয়েরি বিশেষ অভাব ছিল। প্রজার তুলনায় জমির পরিমাণ এত বেশি ছিল যে জমিদারেরা নামমাত্র নিরিখে পাইকস্ত প্রজাকে দিয়ে জমি চাষ করাতেন।

(৩) জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের ছিল না। এর একটি

প্রমাণ এই যে, বাঙলার কোনো নবাবই আসল জমা কখনো বাড়ান নি। আসল জমা স্থির রেখে আবয়াব বাড়ানোই ছিল তাঁদের মামুলি দস্তুর। রাজার প্রাপ্য ছিল প্রজার উৎপন্ন ফসলের একটি অংশমাত্র, সে অংশের হ্রাসবৃদ্ধি করবার অধিকার রাজারও ছিল না।

খালি বাঙলার প্রজা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রজা এই সকল সত্ত্বে সত্ত্ববান ছিল। প্রমাণ স্বরূপ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, পি-আর-এস মহাশয়ের "পেশবাদিগের রাজ্য-শাসন পদ্ধতি" নামক প্রবন্ধ থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।—

মারাঠী পল্লীর চাষীদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—মিরাসদার বা মিরাঠী (খোদকস্ত) ও উপরি (পাইকস্ত)। মিরাসীরা গ্রামেরই লোক, গ্রামের জমি চাষ করিত। সে জমিতে তাহাদের একটি স্থায়ী স্বত্ব থাকিত। খাজানা বাকী না ফেলিলে কাহারও অধিকার ছিল না যে তাহাদের জমি কাড়িয়া লয়। বাকী খাজানার দায়ে জমি হস্তান্তর হইলেও কিন্তু তাহাতে মিরাসীর সত্ত্ব একেবারে লুপ্ত হইত না। ৩০।৪০ এমন কি ৬০ বৎসর পরেও বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিলেই, মিরাসী তাহার জমি ফিরিয়া পাইত। * * * * * মিরাসীরা গ্রাম প্রতিষ্ঠাতাদিগেরই বংশধর। মনুর বিধান অনুসারে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরাই গ্রাম্য জমির মালিকীস্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন। * * * অবশ্য সরকারের বার্ষিক কর প্রত্যেক গ্রাম্যসমিতির প্রধান ও প্রথম দেয়। এই করের হার সরকারের কর্ম্মচারীগণ "পাটীলের" (মণ্ডল) সঙ্গে একত্র হইয়া গ্রামের জমি ও চাষের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া স্থির করিতেন—" (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩২৬, পৃঃ ৪১১)।

এককথায় সেকালে জমির অধিকারী ছিল প্রজা, আর তার উপসত্ত্বের আংশিক অধিকারী ছিলেন রাজা। জমিদার এই রাজস্বেরই

এক অংশ পেতেন, তিনি ছিলেন ইংরাজিতে যাকে বলে টেম্পকালেক্টর, অর্থাৎ—জমিদার মাইনের বদলে আদায়ের উপর কমিসন পেতেন, আজও যেমন অনেক জমিদারীতে তহশীলদারেরা পেয়ে থাকে। তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, একালে তহশিলদারেরা শতকরা পাঁচ টাকা হারে কমিশন পায়, সেকালে জমিদারেরা দশ টাকা হারে পেত।

জন কোম্পানী কিন্তু এদেশের জমিদার-রায়তের মিশ্র সম্বন্ধকে শুদ্ধ করলেন—এই সম্বন্ধ উল্টে ফেলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে জমিদার হলেন বাঙলার মাটীর সত্ত্বাধিকারী, আর প্রজা হল তার উপসত্ত্বের আংশিক অধিকারী।

কিন্তু এ পরিবর্ত্তন কোম্পানীর বড় কর্ত্তারা সচ্ছন্দ চিত্তে করেন নি। এ ভয় তাঁদেরও হয়েছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বলে জমিদার প্রজার ভক্ষক না হয়ে ওঠেন। অতএব সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের রক্ষার ব্যবস্থাও যে করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে তাঁরা প্রায় সকলেই একমত ছিলেন। এখানে আমি শুধু দুটি লোকের মত উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, প্রথম Francis সাহেবের, তারপর Lord Cornwallis-এর; কারণ এঁদের একজন হচ্ছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জনক, আর একজন তার জননী।

Mr Francis proposed, that it should be made an indispensable "condition with the zemindar, that in the course of a stated time, he shall grant new pottahs to his tenants either on the same footing with his own quit rents, that is as long as the

zemindar's quit rent remains the same, or for a term of years, as they may agree—"

Francis সাহেবের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে Shore সাহেবের মন্তব্য হচ্ছে এই :—

"The former is the custom of the country, this will become a new *assil jumma* for each ryot, and ought to be as sacred as the zsmindar's quit rent—" (Fifth Report, Vol. II, p. 88).

এখন Lord Cornwallis-এর কথা শোনা যাক্।—

"—unless we suppose the ryots to be absolute slaves of zemindar's :—every *begha* of land possessed by them, must have been cultivated under an express or implied agreement, that a certain sum should be paid for each *begha* of produce and no more.—"

(Fifth Report, Vol. II, p. 532).

সুতরাং দেখা গেল যে, প্রজা আজ যে-সকল সত্বের দাবী করছে সে-সকল সত্ব প্রজার যে মান্ধাতার আমল থেকে ছিল, এ সত্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্মদাতারাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এবং শুধু স্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, প্রজার ওই সব মামুলি সত্ব যে তাঁরা আইনত রক্ষা করবেন, এ প্রতিজ্ঞাও তাঁরা উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই লিপিবদ্ধ করেছেন—"It being the duty of

the ruling power to protect all classes of people, and more particularly those who from their situation are most helpless, the Governor-General in Council will, whenever he may deem it proper, enact such regulations as he may think necessary for the protection and welfare of the dependent taluqdars, raiyats and other cultivators of the soil.—" (*Vide.* cl. I, s. 8, reg. I of 1793).

দুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রতিজ্ঞা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোটেই পালন করেন নি; যদিচ রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পার্লেমেণ্টারি কমিটিকে কোম্পানী বাহাদুরের এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

কোম্পানীর আমল শেষ হয়ে যখন মহারাণীর আমল সুরু হল তখন উক্ত আইনের ৮ ধারার আশ্রয়ে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের দশ আইন পাশ করা হল। এই হচ্ছে Tenancy Act-এর প্রথম সংস্করণ। এই আইন অবশ্য কালক্রমে অনেক পরিমাণে সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও এ আইনের প্রসাদে যে, শুধু মামলা বেড়েছে তার কারণ, ইংরাজিতে যাকে বলে half-measures; অর্থাৎ—আধা-খেঁচড়া ব্যবস্থা, তার ফলে শুধু নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি হয়।

আজকের দিনে প্রজার সকল দাবী আইনত গ্রাহ্য হলে, প্রজা যে হাঁফছেড়ে বাঁচবে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই এবং জমিদার-বর্গের নিকট আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন এ বিষয়ে প্রজার

প্রতিপক্ষ না হন। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আজকের দিনে কেউ তা বলতে পারে না। তবে একথা ভরসা করে বলা যায় যে, গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সকল সমাজের, কি আর্থিক কি রাজনৈতিক, সকল ব্যবস্থারই গোড়া আলগা হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা যদি আগে থাকতেই সমাজের নতুন ঘর বাঁধতে সুরু না করি তাহলে দু-দিন বাদে হয়ত দেখতে পাব যে আমাদের মাথা লুকোবার আর স্থান নেই, আমরা সব রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের সম্বোধন করে বলেছিলেন :—

"তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার গুণে নহে, অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে সেও তাহার দোষ নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না, মনে থাকে যেন সে তোমারই ভাই—তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ এবং তাঁহার ভ্রাতা—"

তিনি আরও বলেন যে :—

"এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলিবে—"

বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ বিধির কথা বলেছিলেন জানো?—ইংরাজিতে যাকে বলে Communal property. এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, ইতিমধ্যে আমরা যদি বাঙলার প্রজাকে peasant proprietor না

করি তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হতে আর বড় বেশি দিন লাগবে না। আশা করি এ প্রবন্ধ পড়ে কেউ মনে করবেন না যে, আমি সাম্প্রদায়িক বিবাদের সূত্রপাত করেছি। সাম্প্রদায়িক বিরোধ হতে বাঙালী সমাজকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে রায়তের সঙ্গে জমিদারের co-operation-এর যে প্রয়োজন আছে, এই হচ্ছে আমার আসল বক্তব্য।—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।